সূচিপত্র

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)
কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা
মাসিক
আল-ইতিছাম
الاعتصام
●১০ম বর্ষ ●১ম সংখ্যা ● নভেম্বর ২০২৫
Web : www.al-itisam.com
হামাস-ইসরাঈল যুদ্ধবিরতি
গাযার ভবিষ্যৎ কী?

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK**
Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM,
Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840
E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة:١٠، جمادى الأولى و جمادى الثاني ١٤٤٧هـ/ نوفمبر ٢٠٢٥م العدد:١، الجزء : ١٠٩
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৭ ‖ ঈসায়ী ২০২৫ ‖ বঙ্গীয় ১৪৩২

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১- নভেম্বর	৯ - জুমাদাল উলা	শনিবার	৪.৪৮	৬.০৪	১১.৪২	২.৫৬	৫.২০	৬.৩৭
০৫- নভেম্বর	১৩ - জুমাদাল উলা	বুধবার	৪.৫০	৬.০৬	১১.৪২	২.৫৪	৫.১৮	৬.৩৫
১০- নভেম্বর	১৮ - জুমাদাল উলা	সোমবার	৪.৫৩	৬.০৯	১১.৪৩	২.৫২	৫.১৫	৬.৩৩
১৫- নভেম্বর	২৩ - জুমাদাল উলা	শনিবার	৪.৫৬	৬.১২	১১.৪৩	২.৫১	৫.১৩	৬.৩১
২০- নভেম্বর	২৮ - জুমাদাল উলা	বৃহস্পতিবার	৪.৫৮	৬.১৬	১১.৪৪	২.৫১	৫.১২	৬.৩১
২৫- নভেম্বর	৩ - জুমাদাল আখের	মঙ্গলবার	৫.০১	৬.১৯	১১.৪৬	২.৫০	৫.১১	৬.৩০
৩০- নভেম্বর	৮ - জুমাদাল আখের	রবিবার	৫.০৪	৬.২৩	১১.৪৮	২.৫১	৫.১১	৬.৩১

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	+১	০	+১
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	০
নরসিংদী	-১	-১	-২
কিশোরগঞ্জ	+৭	+৮	+৩
টাঙ্গাইল	+৩	+২	+১
ফরিদপুর	+৫	+৪	+৬
রাজবাড়ী	+৪	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	০
গোপালগঞ্জ	+২	+১	+৩
মাদারীপুর	+১	০	+১
মানিকগঞ্জ	+৩	+২	+২
শরিয়তপুর	০	-১	+১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	+১	+১	-১
শেরপুর	+৩	+৩	০
জামালপুর	+৩	+৩	+১
নেত্রকোনা	-১	-১	-৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৭	-৮	-৫
খাগড়াছড়ি	-৮	-৯	-৭
রাঙ্গামাটি	-৭	-৯	-৬
বান্দরবান	-৮	-১০	-৬
কুমিল্লা	-৩	-৪	-৩
নোয়াখালী	-৩	-৪	-২
লক্ষ্মীপুর	-২	-৩	-১
চাঁদপুর	-৩	-৪	-২
ফেনী	-৪	-৫	-৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৪

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৫	-৫	-৭
সুনামগঞ্জ	-৩	-৩	-৬
মৌলভীবাজার	-৫	-৫	-৭
হবিগঞ্জ	-৩	-৪	-৫

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৮	+৮	+৬
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+৯	+৭
নাটোর	+৬	+৬	+৫
পাবনা	+৫	+৫	+৪
সিরাজগঞ্জ	+৪	+৩	+২
বগুড়া	+৫	+৪	+৪
নওগাঁ	+৮	+৮	+৫
জয়পুরহাট	+৬	+৭	+৪

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+৬	+৭	+২
দিনাজপুর	+৭	+৮	+৪
গাইবান্ধা	+৫	+৫	+২
কুড়িগ্রাম	+৫	+৫	+১
লালমনিরহাট	+৬	+৬	+১
নীলফামারী	+৮	+৮	+৩
পঞ্চগড়	+৯	+১০	+৪
ঠাকুরগাঁও	+১০	+১০	+৬

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৩	+২	+৪
বাগেরহাট	+২	+১	+৪
সাতক্ষীরা	+৫	+৩	+৬
যশোর	+৫	+৪	+৫
চুয়াডাঙ্গা	+৫	+৪	+৫
ঝিনাইদহ	+৫	+৪	+৫
কুষ্টিয়া	+৬	+৬	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭
মাগুরা	+৪	+৩	+৪
নড়াইল	+৩	+২	+৪

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	০	-১	+১
পটুয়াখালী	০	-২	+২
পিরোজপুর	+১	০	+৩
ঝালকাঠি	০	-১	+২
ভোলা	-১	-৩	০
বরগুনা	+১	-১	+৩

■ সূত্র : ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org) ■ গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

১০ম বর্ষ
১ম সংখ্যা
নভেম্বর ২০২৫
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩২
জুমাদাল উলা-জুমাদাল আখের ১৪৪৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

উপদেষ্টা
◆ শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
◆ শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
◆ শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
হযরত আলী
হাসান আল-বান্না মাদানী
আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
মো. আকরাম হোসেন

বিভাগীয় সম্পাদক
◆ মো: নাসির উদ্দিন ◆ আল আমিন
◆ আব্দুল কাদের

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
সার্কুলেশন ম্যানেজার মো: নাইমুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা
আসিফ আহমাদ ও আব্দুল্লাহ আল মামুন

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী
০১৪০৭-০২১৮২২
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, দিনাজপুর
০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বরিশাল
০১৭২৩-০০৮৪৯১
জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২
সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সূচিপত্র

◆ সম্পাদকীয় ০২

◆ দারসে কুরআন
» মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদতের ধারাবাহিকতা: একটি বিশ্লেষণ ০৩
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◆ প্রবন্ধ
» ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান (পর্ব-৮) ০৮
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
» আদ-দাওয়া ইলাল্লহ: এসো! আল্লাহর পথে... (পর্ব-৫) ১৩
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
» মসজিদের আদব-কায়দা বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল ১৫
-ড. আবুল কালাম আযাদ
» ছোট স্বপ্ন নয়, মহৎ উদ্দেশ্যের পথে ১৭
-সায়্যিদ তাসনীম আল আমান
» দাওয়াত ও তাবলীগ ১৯
-শাহাদাত হোসেন সামি
» আয়াতুল কুরসীর ফযীলত ২১
-জিশান মাহমুদ
» তাক্বদীরে বিশ্বাস ২৩
-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ

◆ হারামাইনের মিম্বার থেকে
» সত্য রক্ষা করে, মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে ২৪
-অনুবাদ: আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

◆ উসওয়াতুন হাসানাহ
» মানুষকে ক্ষমা করা শিখতে হবে! ২৭
-হাসান আল-বান্না মাদানী

◆ তরুণ প্রতিভা
» সফলতার সূত্র ২৯
-সাব্বির আহমাদ

◆ সাময়িক প্রসঙ্গ
» শিশুদের মোবাইল আসক্তির কারণ ও প্রতিকার ৩১
-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী

◆ দিশারী
» কলুষিত অন্তরকে বিশুদ্ধকরণ ৩৫
-রাকিব আলী

◆ ইতিহাসের পাতা থেকে
» পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ: যেখানে আমরা সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে ৩৭
-সাঈদ আল মাহমুদ

◆ কবিতা ৪২

◆ সংবাদ ৪৩

◆ সওয়াল-জওয়াব ৪৫

সার্বিক যোগাযোগ
প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী, ৬২১০

সহকারী সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৮ | ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৯
সার্কুলেশন ম্যানেজার
০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০ বিকাশ মার্চেন্ট

www.al-itisam.com
youtube.com/c/alitisamtv
facebook.com/alitisam2016
monthlyalitisam@gmail.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

হামাস-ইসরাঈল যুদ্ধবিরতি: গাযার ভবিষ্যৎ কী?

দীর্ঘ দুই বছর যাবৎ গাযা ও ইসরাঈলের মধ্যে চলমান যুদ্ধ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় সাময়িক যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। ৯ অক্টোবর সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টের মাধ্যমে ট্রাম্প জানান তার প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তির প্রথম ধাপে উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছে। ১০ অক্টোবর সকালে ইসরাঈল তার মন্ত্রিসভায় এটিকে অনুমোদন দেয়। সেই দিনই দুপুর ১২টায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। উক্ত যুদ্ধবিরতিকে সকল পক্ষ নিজ নিজ বিজয় হিসেবে দাবি করছে। যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতায় মুসলিম দেশগুলোর মধ্য থেকে তুরস্ক, মিশর, কাতার ও সঊদী আরব মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। উক্ত যুদ্ধবিরতির পূর্বে ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০ দফা শান্তি প্রস্তাব তুলে ধরেন। তার সেই শান্তি প্রস্তাবকে সামনে রেখেই যুদ্ধবিরতির আলোচনা নতুন করে শুরু হয়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের উত্থাপিত সেই শান্তি প্রস্তাবের যে প্রথম ধাপে উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছে তা হচ্ছে, ইসরাঈল তার বাহিনীকে গাযার শহর ও আবাসিক এলাকাগুলো থেকে একটি নির্দিষ্ট এরিয়ায় সরিয়ে নিবে। রাফাহ সীমান্ত দিয়ে সকল ধরনের ত্রাণ প্রবেশের অনুমতি দিবে। উভয়পক্ষ তাদের কাছে থাকা বন্দিদের মুক্তি দিবে। উক্ত প্রস্তাবের দ্বিতীয় ধাপের যে বিষয়গুলো এখনো অমীমাংসিত রয়েছে তা হচ্ছে, গাযার শাসনব্যবস্থা ও হামাসের নিরস্ত্রীকরণ। আমেরিকার শান্তি প্রস্তাব অনুযায়ী হামাসকে নিরস্ত্রীকরণ করতে হবে। গাযার দায়িত্ব নিবে আন্তর্জাতিক তৃতীয় কোনো পক্ষ। হামাসের দাবি হচ্ছে গাযার দায়িত্ব পালন করবে ফিলিস্তীনি কর্তৃপক্ষ। এই বিষয়টি এখনো আলোচনার টেবিলে রয়েছে; চূড়ান্ত কোনো মীমাংসা হয়নি।

আর এই কারণেই সুদীর্ঘ এই যুদ্ধের প্রাথমিক যুদ্ধবিরতির পরও উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপক অবিশ্বাস, আলোচনা ও সমালোচনা চলমান। বিশেষত, এই দুই বছরে আসলে কাদের বিজয় হয়েছে—সেটি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে তুমুল বিতর্ক। একদল বিশ্লেষকের মতে, এটি ইসরাঈলের বিজয়। কেননা সে তার যুদ্ধবন্দিদেরকে উদ্ধার করতে পারছে। উদ্ধার শেষ হলে পুনরায় গাযা দখল করা তার কাছে কিছুই নয়। কেননা গাযা এখন সম্পূর্ণরূপে বিরানভূমি ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে আছে। এই সমতল ভূমিতে পুনরায় দখল প্রতিষ্ঠা করা ইসরাঈলের কয়েক সেকেন্ডের সিদ্ধান্ত মাত্র। সেহেতু বর্তমান যুদ্ধবিরতি মূলত ইসরাঈলী যুদ্ধবন্দিদের উদ্ধারে ইসরাঈলের একটি কৌশল মাত্র। কেননা ইতোমধ্যে গাযায় ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে ইসরাঈল প্রমাণ করে দিয়েছে—সে দুনিয়ার কোনো আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করে না। এমনকি চলমান যুদ্ধবিরতির আলোচনা চলা অবস্থায় ডোনাল্ড ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম ট্রুথে ইসরাঈলকে গাযায় হামলা বন্ধের ইমিডিয়েট নির্দেশ দেওয়ার পরও ইসরাঈল হামলা চলমান রেখেছিল। সুতরাং ইসরাঈল আমেরিকার আদেশ মেনে নিবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। শুধু তাই নয়, গত দুই বছরে ইসরাঈল শুধু গাযায় হামলা চালায়নি; বরং সিরিয়া, কাতার, লেবানন, ইয়ামান ও ইরানসহ বিভিন্ন দেশে হামলা চালিয়েছে। যা প্রমাণ করে, তার কাছে আরব বিশ্বের কোনো দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ন্যূনতম মূল্য নেই।

অন্যদিকে আরেকদল বিশ্লেষক মনে করছেন, উক্ত যুদ্ধবিরতি হামাসের এক প্রকার বিজয়। কেননা ইসরাঈল যখন যুদ্ধ শুরু করে তখন তার দাবি ছিল—সে কখনোই সন্ত্রাসীদের সাথে আলোচনায় বসবে না। সে শক্তির জোরে সন্ত্রাসীদের নির্মূল করেই তার যুদ্ধবন্দিদের উদ্ধার করবে। এই দাবির ভিত্তিতেই সে গাযাকে সম্পূর্ণরূপে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে পরিপূর্ণ সমতল ভূমিতে পরিণত করেছে। গাযার বুকে আর কোনো বিল্ডিং মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে নেই। বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও হাসপাতাল থেকে শুরু করে সব ধ্বংস করা হয়েছে। ৬৭ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সুপার পাওয়ার আমেরিকার সহযোগিতা নিয়ে ইসরাঈলের দুই বছর যাবৎ নৃশংস হামলা চালানোর পরও, সম্পূর্ণ গাযাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার পরও, ইসরাঈল তার শক্তির জোরে তার যুদ্ধবন্দিদের উদ্ধারে ব্যর্থ হয়েছে। এটি ইসরাঈলের চরম পরাজয়। যাদেরকে সন্ত্রাসী ঘোষণা দিয়ে তাদের সাথে কোনোরকম আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তাদের সাথে আলেচনায় বসেই চুক্তি করেই তাকে যুদ্ধবন্দি উদ্ধার করতে হচ্ছে। এর চেয়ে বড় লজ্জার আর কী হতে পারে? সেক্ষেত্রে এই যুদ্ধ আরও দীর্ঘ হলে ক্ষয়ক্ষতি বাড়া ছাড়া কোনো অর্জন হতো বলে মনে হয় না। শুধু গত দুই বছরে প্রায় ১২০০ ইসরাঈলী সৈন্য নিহত হয়েছে। প্রায় ২০ হাজার সৈন্য শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা গ্রহণ করেছে। যা ইসরাঈল সৃষ্টির পর থেকে সর্বোচ্চ। গত দুই বছরে ইসরাঈলের আনুমানিক খরচ প্রায় ২৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এছাড়া সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ সীমাহীন।

জয়-পরাজয় নিয়ে বিশ্লেষকদের বিশ্লেষণ যাই হোক না কেন, সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, বর্তমান যুদ্ধের সময় মিডিয়া জগতে ইসরাঈলের একক কোনো আধিপত্য না থাকায়, টিকটক, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপেন প্লাটফর্মের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ইসরাঈলের প্রতিষ্ঠিত ন্যারেটিভ ভেঙে পড়েছে। আমেরিকা ও ইউরোপের জনগণ গাযার মানুষের অধিকারের জন্য রাস্তায় নেমে এসেছে। কলম্বিয়াসহ বিভিন্ন নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক প্রতিবাদ হয়েছে। এককথায় গাযার পক্ষে সমগ্র বিশ্বে এক নতুন আলোড়ন তৈরি হয়েছে। যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল সুমুদ ফ্লোটিলার নৌবহর।

সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ ৫৬ নং পৃষ্ঠায়

মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদতের ধারাবাহিকতা: একটি বিশ্লেষণ

-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল*

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ - وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾

সরল অনুবাদ: 'তারা যা বলে, তাতে আপনার বক্ষ সংকীর্ণ হয়, তা আমি অবশ্যই জানি। কাজেই আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাসবীহ পড়ুন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন। আর আপনার প্রতিপালকের ইবাদত করে যান, যতক্ষণ না আপনার কাছে নিশ্চিত বিষয় (মৃত্যু) আসে' *(আল-হিজর, ১৫/৯৭-৯৯)*।

ভূমিকা:

কুরআন শুধু আধ্যাত্মিক গ্রন্থ নয়, বরং বাস্তব জীবনের যে কোনো সমস্যার সমাধান কুরআনে আছে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কুরআনে বহুবার মানসিক দৃঢ়তা, ধৈর্য এবং আল্লাহর স্মরণে প্রশান্তি খোঁজার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত আয়াতসমূহ মুসলিমদের জন্য যুগ যুগ ধরে মানসিক প্রশান্তি ও ধৈর্য শিক্ষার অবলম্বন হয়ে থাকবে।

ইসলাম মানবজীবনের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান। এ জীবনবিধান মূলত একটি ইবাদতভিত্তিক জীবনবিধান। এ সমাজের সর্বস্তরে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করা এ জীবনবিধানের মূল উদ্দেশ্য, যা কোনো নির্দিষ্ট সময় বা ঋতুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আজীবন চলমান এক নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা। ইবাদত শুধু আচার-অনুষ্ঠান নয়, বরং মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা। কুরআনে আল্লাহ বলেন, ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ 'আপনার প্রতিপালকের ইবাদত করুন, যতক্ষণ না তোমার মৃত্যু এসে যায়' *(আল-হিজর, ১৫/৯৯)*।

তাহলে বুঝা গেল, ইসলাম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকার জীবনব্যাপী দিকনির্দেশনা দিয়েছে। ইবাদতের চূড়ান্ত সীমানা হলো মৃত্যু, এর আগে ইবাদত থেকে অব্যাহতি লাভের কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ 'নিশ্চয় যারা বলে, আল্লাহ আমাদের রব, তারপর তার উপর (মৃত্যু পর্যন্ত) অটল থাকে, তাদের উপর ফেরেশতারা নাযিল হন' *(ফুছছিলাত, ৪১/৩০)*। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মৃত্যু আসা পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত করো'।[১] এটি প্রমাণ করে যে, ধারাবাহিকতা ও অধ্যবসায়-ই প্রকৃত সফলতার চাবিকাঠি।

আয়াতের শানে নুযুল:

মক্কার কাফেররা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নানা ধরনের কটূক্তি, মিথ্যা অভিযোগ, উপহাস ও বিরূপ মন্তব্য করত। এতে তিনি অন্তরে কষ্ট পেতেন এবং দাওয়াতী কার্যক্রমের মহান দায়িত্ব আরও ভারী মনে হতো। আল্লাহ তাআলা মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সান্ত্বনা দিয়ে অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন, 'আমি জানি আপনার হৃদয় সংকীর্ণ হয়'। কিন্তু আপনার হৃদয়ের সংকীর্ণতা সম্পর্কে আপনার রব অজ্ঞাত নন, বরং তিনি আপনার অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন।[২]

১. সান্ত্বনা লাভ করা: নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কাফেরদের উপহাস, মিথ্যা অভিযোগ ও কটূক্তিতে মানসিকভাবে কষ্ট পেতেন। তাঁর পরিস্থিতি হয়েছিল যে, তিনি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, আপনার প্রতিপালক আপনার কষ্ট সম্পর্কে অজ্ঞাত নন। একজন আদর্শ দাঈ সবসময় প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন। তিনি মনে করেন সত্যের দাওয়াত বহন করা মানেই পরীক্ষা, চ্যালেঞ্জ ও বিপদের মুখোমুখি হওয়া। কঠিনতম সময়েও তিনি সত্যের উপর অটল থাকেন এবং ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর পথে অগ্রসর হন।

যারা ইসলামের আলোকে জীবন যাপন করে এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলে, তাদের জীবনে পরীক্ষা আসবে এটাই স্বাভাবিক। তাদের জীবন আয়েশময় হবে আর তারা ঝঞ্ঝাটমুক্ত থাকবে এমনটা নয়। কারণ বিরোধিতা ও অপবাদ হলো হক্বের পথে দাওয়াতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তবে এ পথের কষ্ট ও মানসিক চাপে দিশেহারা না হয়ে আল্লাহর প্রশংসা, তাসবীহ ও যিকিরের মাধ্যমে অন্তরের অশান্তি ও দুঃখ দূর করতে হবে। আল্লাহ তাঁর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কষ্টের সময় তিনটি উপায় শিক্ষা দিয়েছেন— তাসবীহ পাঠ, সিজদা করা এবং ইবাদতে মগ্ন থাকা।[৩] এটাই হলো দুঃখ-কষ্ট থেকে উত্তরণের শ্রেষ্ঠ উপায়। কেননা আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়, মনোবল দৃঢ় হয় এবং বিশ্বাস শক্তিশালী হয়।

---

* প্রভাষক (আরবী), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৬৩।
২. ওয়াহবাতুল যোহাইলী, তাফসীরুল মুনীর, ১৪/৭৪।
৩. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৪/৬৬৫।

আল্লাহর রাসূল ﷺ- যিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, তিনিও দুঃখ-কষ্টের ভার অনুভব করেছেন; কিন্তু আল্লাহ তাঁকে ধৈর্য, যিকির ও ইবাদতের মাধ্যমে সান্ত্বনা দান করেছেন। অতএব, অন্তরের অশান্তি ও দুঃখ-কষ্ট দূর করার সর্বোত্তম পথ হলো আল্লাহর প্রশংসা করা, ছালাতে সিজদায় অবনত হওয়া এবং নিরলসভাবে ইবাদত চালিয়ে যাওয়া।

২. মানসিক কষ্ট সহ্য ও ধৈর্যের নির্দেশনা: নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর হৃদয়ের কষ্ট ও মানসিক চাপ কুরআনে স্বীকৃত বাস্তবতা। দাওয়াতের পথে তাঁকে শত্রুতামূলক কথাবার্তা ও বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ সহ্য করতে হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ 'আমি জানি, তারা যা বলে তাতে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়' *(আল-হিজর, ১৫/৯৭)*। তবে মনে রাখতে হবে, প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা মানুষের হাতে নয়, বরং তা আল্লাহর দান। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'তাদের কথায় আপনি দুঃখিত হবেন না। নিশ্চয়ই সমস্ত সম্মান আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুমিনদের জন্য' *(আল-মুনাফিকূন, ৬৩/৪)*।

এ কষ্ট নতুন কিছু নয়, পূর্ববর্তী নবীরাও বিরোধিতা, মিথ্যাচার ও নানা যন্ত্রণার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তারা ধৈর্যধারণ করেছিলেন, ফলে তাদের উপর আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ বলেন, 'অতএব, ধৈর্যধারণ করুন, যেমন দৃঢ়চিত্ত রাসূলগণ ধৈর্যধারণ করেছিলেন' *(আল-আহক্বাফ, ৪৬/৩৫)*। আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا﴾ 'আপনার পূর্ববর্তী নবীদেরও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। তারা ধৈর্যধারণ করেছিলেন এবং কষ্ট সহ্য করেছিলেন, অবশেষে তাদের কাছে আমাদের সাহায্য পৌঁছেছিল' *(আল-আনআম, ৬/৩৪)*। সর্বশেষে নবী ﷺ-কে মানুষের কষ্টদায়ক কথাবার্তা উপেক্ষা করার এবং একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ 'কাফের ও মুনাফেক্বদের আনুগত্য করো না, তাদের কষ্টদায়ক কথায় ভ্রূক্ষেপ করো না এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করো' *(আল-আহযাব, ৩৩/৪৮)*।

এভাবেই কুরআন আমাদের শিক্ষা দেয় যে, নবীদের পথ হলো ধৈর্য, আল্লাহর প্রতি আস্থা এবং মানুষের কথায় বিচলিত না হওয়ার আদর্শ আর এটাই একজন আদর্শ দাঈ বা রাসূল ﷺ-এর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।

৩. মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদত অব্যাহত রাখা: মুসলিমের জীবন শুধু মাসিক বা বার্ষিক কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদতের নাম নয়; বরং মৃত্যু পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতের ধারাবাহিক যাত্রা। নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহকে যথাযথ ভয় করুন এবং মুসলিম হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করবেন না' *(আল-আনআম, ৩/১০২)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ 'যে ব্যক্তি বলে, আমার রব আল্লাহ, তারপর সে তার উপর অটল থাকে, ফেরেশতারা তার নিকট (রহমত নিয়ে) অবতীর্ণ হন' *(ফুছছিলাত, ৪১/৩০)*। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করো। যদি তা না পার, তবে বসে পড়ো আর যদি তাও না পার, তবে কাত হয়ে (শুয়ে) ছালাত আদায় করো'।[৪] অর্থাৎ মৃত্যু আসা পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত করো। নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ 'আপনি আপনার প্রতিপালকের ইবাদত করুন, যতক্ষণ না আপনার ইয়াক্বীন আসে' *(আল-হিজর, ১৫/৯৯)*। এখানে 'ইয়াক্বীন' দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইবাদত অব্যাহত রাখুন। ইসলামে এমন কোনো সময় নেই, যখন ইবাদত থেকে বিরতি গ্রহণ করা যায়। শৈশব, যৌবন কিংবা বার্ধক্য—জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই বান্দার কর্তব্য হলো আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবাদতে ধারাবাহিকতা রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো সেই আমল, যা নিয়মিতভাবে করা হয়, যদিও তা (পরিমাণে) সামান্য হয়'।[৫]

এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা বান্দার নিকট থেকে নিরবচ্ছিন্ন ইবাদত প্রত্যাশা করেন। মৃত্যু যেহেতু জীবনের শেষ সীমা, তাই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বান্দার দায়িত্ব হলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখা। কুরআনে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'যেদিন তারা মারা যাবে, সেদিন পর্যন্ত তারা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং আল্লাহর হুকুম থেকে বিমুখ হবে না' *(মারইয়াম, ১৯/৫৯)*।

অতএব, মুমিনের জীবন ইবাদতের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠতে হবে। ইবাদত কেবল বিশেষ মুহূর্তের কাজ নয়, বরং আজীবন চলমান একমাত্র প্রধান দায়িত্ব। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত অবিরামভাবে চলতে থাকবে।

আয়াতগুলোর জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ:

১. মানসিক চাপ সামলাতে কুরআনের দিকনির্দেশনা: মনোবিজ্ঞানে আল-কুরআনে ব্যবহৃত 'ضيق الصدر' শব্দবন্ধের অর্থ হলো 'Anxiety' বা 'Depression'। এর দ্বারা হৃদয়ের অস্বস্তি, মানসিক অস্থিরতা ও উদ্বেগকে বুঝানো হয়। যখন মানুষ উপহাস, বিদ্রূপ বা অন্যায় সমালোচনার সম্মুখীন হয়, তখন তার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে যায়, মনে অস্বস্তি ও সংকীর্ণতা জন্ম নেয়। এ অবস্থায় ব্যক্তি গভীর উদ্বিগ্নতায়

৪. ছহীহ বুখারী, হা/১১১৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৩৫১।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৬৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৪২।

নিমজ্জিত হয় এবং মানসিকভাবে চাপে পড়ে, যা বর্তমান মনোবিজ্ঞানে উদ্বেগ ও বিষণ্নতারূপে চিহ্নিত।

২. আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সামঞ্জস্য: দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত মানুষের অবস্থা পরিবর্তন, অশান্ত হৃদয়ের প্রশান্তি এবং হতাশা ও সংকীর্ণতার অন্ধকার থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে আধুনিক বিশ্বে নানা কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— (ক) নিয়মিত ধ্যান (Meditation), যা গভীর চিন্তার মাধ্যমে মানসিক চাপ কমায়; (খ) ইতিবাচক বাক্যাবলির উচ্চারণ (Positive Affirmations), যা মস্তিষ্কে সাময়িক প্রশান্তি আনে; (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ (Breathing Exercises), যা উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা কমাতে সহায়তা করে। নিঃসন্দেহে এসব পদ্ধতির সুফল ও ইতিবাচক প্রভাব আজকাল ব্যাপকভাবে আলোচিত হলেও আল্লাহর যিকির, ছালাত আদায় ও কুরআন তেলাওয়াতের মহিমা ও গভীরতার তুলনায় এগুলো অত্যন্ত সীমিত ও ক্ষুদ্র। কেননা এসব কৌশল কেবল মনঃসংযোগ সৃষ্টি করে, অথচ ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত হয়। এর ফলশ্রুতিতে সে শুধু সাময়িক নয়; বরং স্থায়ী প্রশান্তি, শক্তি ও আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি লাভ করে।

এই মানসিক বিষণ্নতার প্রকৃত প্রতিষেধক বস্তুগত কোনো উপাদান নয়, বরং এর মূল চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে আধ্যাত্মিক জগতে। হতাশায় ব্যর্থ না হয়ে মহান আল্লাহর ধ্যানে ফিরে আসাই হলো সেই আধ্যাত্মিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। যিকির, তাসবীহ, কুরআন তেলাওয়াত ও ছালাত মানুষের অন্তরের অশান্তিকে প্রশমিত করে, সিজদার নিবেদন ও আল্লাহর স্মরণ ভগ্ন হৃদয়ে দৃঢ়তা এনে দেয় এবং শক্তিতে বলীয়ান করে।

রাসূল ﷺ-এর জীবনাদর্শ মুসলিমদের জন্য আধ্যাত্মিক পথে চলার একমাত্র অবলম্বন। কঠিন সময়েও কীভাবে ঈমানকে অটল রাখা যায় এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে অন্তরের শান্তি অর্জন করা যায় সে শিক্ষা তারা তাঁর জীবন থেকেই লাভ করেন। ইসলামের আধ্যাত্মিক চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রচলিত যেকোনো চিকিৎসা পদ্ধতির তুলনায় অনেক গভীর, সর্বাঙ্গীন ও অদ্বিতীয়। কেননা এটি কেবল মানসিক অনুশীলন বা মনঃসংযোগ নয়, বরং মানুষের অন্তরকে সরাসরি মহান স্রষ্টার সঙ্গে যুক্ত করার জীবন্ত মাধ্যম।

ঈমানের সেই দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে মানুষ খুঁজে পায় প্রকৃত শান্তি, নিরাপত্তা ও প্রশান্তির আশ্রয়। আল্লাহর স্মরণেই দুঃখী হৃদয় প্রশান্ত হয়, উদ্বিগ্ন প্রাণ নিশ্চিন্ত হয় আর ভগ্ন আত্মা খুঁজে পায় পুনর্গঠনের অমূল্য শক্তি। অতএব, প্রকৃত শান্তি খুঁজতে হলে ফিরে আসতে হবে আল্লাহর স্মরণে, ছালাতে, তেলাওয়াতে ও সিজদাতে। আল্লাহর নৈকট্যই হলো মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

৩. সমালোচনার মুখেও ধৈর্য ও স্থিরতার মাধ্যমে সত্যের ওপর অটল থাকা: রাসূলুল্লাহ ﷺ দাওয়াতের পথে কটূক্তি, উপহাস ও অবমাননার শিকার হতেন। মানুষের অন্যায় সমালোচনা ও দুর্নামে আঘাত পেতেন। কিন্তু তিনি দাওয়াতী কার্যক্রম থেকে কখনো পিছপা হতেন না; বরং আল্লাহর সাহায্য আসবে এই আশায় ধৈর্য ধরে অবিচল থাকতেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়ে বলেন, ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ ‘তারা যা বলে, তাতে ধৈর্যধারণ করুন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন’ *(ত্ব-হা, ২০/১৩০)*। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে আরও বলেন, ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ ‘আমি তো ভালোভাবেই জানি, তাদের কথায় আপনার বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে আসে। সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং সিজদাকারীদের দলভুক্ত হোন’ *(আল-হিজর, ১৫/৯৭-৯৮)*। ধৈর্যের তাৎপর্য বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ ‘আর অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে। আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৫৫)*।

অতএব, সমালোচনা সহ্য করার একমাত্র পথ হলো ধৈর্য, আল্লাহর ওপর ভরসা এবং তাঁর স্মরণে দৃঢ় থাকা।

ধৈর্যধারণের উপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর এই বাণীটি প্রণিধানযোগ্য, তিনি ﷺ বলেন, ‘কেউ ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত কোনো দান লাভ করেনি’।[৬]

সুতরাং, অন্যের সমালোচনায় আত্মসম্মান হারিয়ে হতাশ হওয়া যাবে না; বরং আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে ধৈর্যের সাথে এগিয়ে চলাই হলো প্রকৃত মুমিনের আদর্শ।

৪. সম্মান বা অপমান মানুষের হাতে নয়, বরং আল্লাহর হাতে: মানুষের কটূক্তি ও অবমূল্যায়ন মুমিনকে বিচলিত করে না। কারণ সে জানে সম্মান, মর্যাদা ও ইযযতের একমাত্র মালিক আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ বলেন, ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ ‘যে ব্যক্তি ইযযত ও মর্যাদা কামনা করে, তার জেনে রাখা উচিত সমস্ত ইযযত, মর্যাদা ও সম্মান কেবল আল্লাহ তাআলার’ *(ফাতির, ৩৫/১০)*। মানুষকে সন্তুষ্ট করার প্রয়াস যতই করা হোক না কেন, তা কখনোই টেকসই মর্যাদার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কারণ মানুষ দ্রুত ভুলে যায় এবং অন্যের সমালোচনা করতে দ্বিধা করে

---

৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৪৬৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৫৩।

না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করলে বান্দার মর্যাদা পৃথিবী ও আখেরাত উভয় জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয় প্রদর্শন করে, আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেন'।[৭] অতএব, বাস্তব জীবনে আমাদের কর্তব্য হলো মানুষকে খুশি করার চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেওয়া। কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই হলো আসল মর্যাদা, প্রকৃত সম্মান এবং চিরস্থায়ী সাফল্যের মূলমন্ত্র।

৫. তাওহীদের গভীর শিক্ষা: আল্লাহকে শুধু উপাস্য হিসেবে স্বীকার করার নাম তাওহীদ নয়, বরং তাঁর পূর্ণতা ঘোষণা করা এবং সকল অপূর্ণতা থেকে তাঁকে পবিত্র ও মুক্ত সাব্যস্ত করাই প্রকৃত তাওহীদ।

তাসবীহের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহকে সকল ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থেকে পবিত্র ঘোষণা করে আর হামদের মাধ্যমে স্বীকার করে যে, আল্লাহ-ই সকল সৌন্দর্য ও পূর্ণতার অধিকারী। এই দুইয়ের সমন্বয়ই তাওহীদের আসল সৌন্দর্য। দুনিয়ার জীবনে মানুষ নানা দুঃখ-কষ্ট, শত্রুতা ও মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়। এসব থেকে মুক্তির প্রকৃত উপায় হলো আল্লাহর যিকির। যেমন- আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন, 'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রেখো! আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়' *(আর-রা'দ, ১৩/২৮)*।

অতএব, দাওয়াতী জীবনে বিদ্রূপ বা বিরোধিতার মুখে মুমিনের করণীয় হলো তাওহীদের উপর দৃঢ় থাকা, আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায় মগ্ন থাকা। কারণ সকল ক্ষমতা, মর্যাদা ও নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহর হাতে। এজন্যই আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, 'তাহলে তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করো' *(আল-বাক্বারা, ২/১৫৫)*। তিনি আরও বলেন, ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ 'তাদের কথায় ধৈর্যধারণ করুন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন' *(ত্ব-হা, ২০/১৩০)*।

যিকির ও ছালাতের মাধ্যমে ঈমান দৃঢ় হয়, হৃদয়ে তাওহীদ সুপ্রোথিত হয় এবং আল্লাহর উপর নির্ভরতা আরও শক্তিশালী হয়। ধারাবাহিক যিকিরই মানুষকে ভয়, হতাশা ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত করে এবং অন্তরে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ মানুষের হৃদয়ের সত্যিকারের শান্তি ও প্রশান্তি কোনো জাগতিক ভরসায় নয়, বরং কেবল আল্লাহর যিকির ও স্মরণেই পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার বলে, তার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায় আর যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহ ও আল-হামদুলিল্লাহ বলে, তার মাধ্যমেও আল্লাহর সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়'।[৮]

৬. দাওয়াতের পদ্ধতিগত শিক্ষা বা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দাওয়াতী দায়িত্ব অব্যাহত রাখা: দাওয়াতের পথে সমালোচনা, বিদ্রূপ ও বিরূপ আচরণ স্বাভাবিক বিষয়। একজন দাঈর দায়িত্ব হলো এসবের মুখে ভেঙে না পড়ে ইবাদত ও যিকিরের মাধ্যমে অন্তরের শক্তি অর্জন করা। আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আমি জানি, তারা যা বলে তাতে আপনার বক্ষ সংকুচিত হয়। কাজেই আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন' *(আল-হিজর, ১৫/৯৭-৯৮)*। তিনি আরও বলেন, 'তাহলে তারা যা বলে তাতে ধৈর্যধারণ করুন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার প্রভুর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন' *(ত্ব-হা, ২০/১৩০)*। পূর্ববর্তী নবীগণও মানুষের বিদ্রূপ, তিরস্কার ও কঠোর আচরণের সম্মুখীন হয়ে ধৈর্যধারণ করতেন এবং মানসিক ভারমুক্তির জন্য আল্লাহর যিকির ও স্মরণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। আল্লাহ বলেন, 'সুতরাং আপনি ধৈর্য ধরুন, যেমন পূর্ববর্তী দৃঢ় সংকল্পবান রাসূলগণ ধৈর্য ধরেছিলেন' *(আল-আহক্বাফ, ৪৬/৩৫)*। তিনি আরও বলেন, 'তাহলে তারা যা বলে তাতে ধৈর্যধারণ করুন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার প্রভুর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করো' *(ত্ব-হা, ২০/১৩০)*। হাদীছেও নির্দেশ আছে, 'দুশ্চিন্তা বা কষ্টে পড়লে বিশেষ দু'আ পাঠ করলে আল্লাহ প্রশান্তি দান করেন'।[৯]

অতএব, দাওয়াতের পথে সফলতা অর্জন ও মানসিক দৃঢ়তা লাভের প্রধান উপায় হলো ধৈর্য, যিকির, দু'আ ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। মানুষের বিরূপ আচরণ নয়, বরং আল্লাহর সান্নিধ্যই একজন দাঈকে প্রকৃত শক্তি ও স্থিতিশীলতা প্রদান করে। মানুষের নেতিবাচক আচরণ একজন দাঈকে দুর্বল করতে পারে না। কারণ প্রকৃত শক্তি আসে কেবল আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে। আল-কুরআনের আরেক আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ 'যারা ঈমান এনেছে, তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণেই প্রশান্ত হয়' *(আর-রা'দ, ১৩/২৮)*। কুরআনের আয়াতসমূহে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, পূর্ববর্তী নবীগণও মানুষের বিদ্রূপ, অস্বীকৃতি ও কঠোর আচরণে মানসিকভাবে ভারাক্রান্ত হতেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুশ্চিন্তা

---

৭. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৮।

৮. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৩০।

৯. মুসনাদ আহমাদ, হা/৩৭১২।

দূর করার সহজ ও কার্যকর উপায় শিক্ষা দেন। ধৈর্য ও যিকিরের শক্তি অর্জনের মাধ্যমেই তারা নানা বাধা ও বিপদ অতিক্রম করেছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা, দু'আ, যিকির ও ছালাত হলো মানসিক প্রশান্তি লাভের প্রকৃত উপায়।

৭. আজকের মুসলিমদের জন্য বাস্তব শিক্ষা: ধর্মচর্চার পথে অগ্রসর হলেই আজও সমালোচনার কণ্টক বিঁধে যায়, বিদ্রূপের তীর এসে অন্তরকে বিদ্ধ করে। তবুও হক্বের পথিকের যাত্রা থেমে থাকে না। সে ছালাতের সঞ্জীবনী শক্তিতে, যিকিরের মাধুর্যে এবং তাসবীহের প্রশান্ত স্রোতে নিজের অন্তরকে দৃঢ় করে। কারণ সে জানে যে, প্রকৃত শক্তি মানুষের জিহ্বায় নয়; বরং প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে আল্লাহর স্মরণে অবিচল অন্তরে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেমন ভয় করা উচিত এবং মুসলিম হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করো না' *(আলে ইমরান, ৩/১০২)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা যতটুকু সহজ মনে করো, ততটুকু কুরআন পড়ো এবং ছালাত ক্বায়েম করো...' *(আল-মুযযাম্মিল, ৭৩/২০)*। প্রধান ইবাদত ছালাত শুধু আধ্যাত্মিক প্রশান্তি নয়, বরং তা নৈতিক সুরক্ষারও উপায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'ছালাত অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে' *(আল-আনকাবূত, ২৯/৪৫)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ আমার রব, তারপর সে তার কথার উপর অটল থাকে, ফেরেশতারা তার নিকট অবতীর্ণ হয়' *(ফুছছিলাত, ৪১/৩০)*। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের আমল গণনা হতে থাকে'।[১০] মুসলিমের জীবন একটানা ইবাদতের ধারাবাহিক যাত্রা, মৃত্যু হলো তার সমাপ্তি বিন্দু। অতএব, ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

৮. ছালাত, যিকির ও সিজদার মাধ্যমে মানসিক শান্তি: মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেতে ছালাত কার্যকরী ওষুধ। সিজদা শুধু শরীরের ক্রিয়া নয়, বরং অন্তরের বিনয় প্রকাশ। এর মাধ্যমে মানসিক চাপ লাঘব হয় এবং আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দুঃখ-কষ্টে গভীর আত্মপ্রশান্তি অর্জন করা যায়। সুশৃঙ্খল জীবন লাভের একমাত্র মাধ্যম হলো ছালাত। মন খারাপ, হতাশা বা দুঃখে পড়লে 'সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ' বলা এবং ছালাতে দাঁড়ানোই হলো সর্বোত্তম থেরাপি। একারণে আল্লাহ বলেন, 'আর সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও' *(আল-হিজর, ১৫/৯৭-৯৮)*। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই ছালাত কুৎসা ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে' *(আল-আনকাবূত, ২৯/৪৫)*। আল্লাহ বলেন, 'তুমি সিজদা করো এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো' *(আল-আলাক্ব, ৯৬/১৯)*। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বান্দা তার রবের সবচেয়ে নিকটে হয় যখন সে সিজদায় থাকে'। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার চোখের শীতলতা (শান্তি) ছালাতে'।[১১] এক ছাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইসলামে কোন কাজটি শ্রেষ্ঠ? তিনি ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সময়ের মধ্যে ছালাত আদায় করা'।[১২] রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুঃখের সময় বলতেন, 'হে বেলাল! ছালাত ক্বায়েম করো, এর দ্বারা আমাদের মন প্রশান্ত করো'।[১৩]

উপসংহার:

সূরা আল-হিজরের আলোচ্য আয়াত, তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াত ও হাদীছসমূহ প্রমাণ করে যে, ইবাদত আজীবনের এক অবিরাম যাত্রা, যা মৃত্যুর মধ্য দিয়েই শেষ হয়। ইবাদত কেবল আচার নয়; বরং নৈতিক দৃঢ়তা, আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও অন্তরের শক্তি প্রদান করে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণাও প্রমাণ করে যে, মানসিক চাপ নিরসনের প্রকৃত সমাধান হলো প্রশান্তির উৎসে মনোনিবেশ করা। ইসলামে সেই প্রশান্তির উৎস হলো ছালাত, যিকির ও তাসবীহ পাঠ। অতএব, মুসলিমের উচিত আজীবন ধারাবাহিকভাবে ইবাদত করা, যাতে মৃত্যুর মুহূর্তে সে আল্লাহর কাছে ঈমানদার বান্দা হিসেবে ফিরে যেতে পারে।

দাওয়াতের পথে বিরোধিতা, অপমান, উপহাস একজন দাঈর জীবনের অনিবার্য সঙ্গী। এখান থেকে উত্তরণের প্রথম ও প্রধান উপায় হলো ধৈর্যধারণ করা। পূর্বের যুগের নবীদের জীবন থেকে ধৈর্যের শিক্ষা নিতে হবে। বিরোধী শক্তির আক্রমণ, কটূক্তি বা মিথ্যাচারকে গুরুত্ব না দিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। মনে রাখতে হবে সাহায্য, মান-সম্মান, ক্ষমতা সবকিছুর মালিকানা আল্লাহর হাতে। এগুলোর কোনো কিছুই মানুষের নিয়ন্ত্রণে নেই।

উক্ত আয়াতগুলো নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরকে সান্ত্বনা দিয়ে যেমন তাঁর দায়িত্বপালনে শক্তি জুগিয়েছে, তেমনি প্রতিটি যুগের মুসলিমের জন্য জীবনের কঠিন মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণে ফিরে যাওয়ার পথনির্দেশনা দিয়েছে। আধুনিক বিশ্বে মানসিক চাপ, ইসলাম বিদ্বেষ ও নৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে আয়াতগুলোর শিক্ষা অত্যন্ত যৌক্তিক ও অধিক প্রাসঙ্গিক।

সূরা আল-হিজরের এই তিনটি আয়াতকে কুরআনের সাইকোস্পিরিচুয়াল থেরাপি (Psychospiritual Therapy) বা মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসা ব্যবস্থা বলা যায়।

---

১০. ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩১।

১১. নাসাঈ, হা/৩৯৪০।

১২. ছহীহ বুখারী, হা/৫২৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৫।

১৩. আবূ দাঊদ, হা/৪৯৮৫; মুসনাদ আহমাদ, হ/২২৫৮৯।

ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান

*-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী**

(পর্ব-৮)

সমকামিতার ইতিহাস:

মানুষের মধ্যে সমকামিতা সর্বপ্রথম শুরু হয়েছিল লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর জাতির মধ্যেই; তাদের আগে আর কেউ এ ধরনের জঘন্য কাজ করেনি। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾ ‘আর স্মরণ করুন লূত্ব-এর কথা, যখন তিনি তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে দুনিয়ার কোনো মানুষ করেনি? তোমরা তো নারীদের ছেড়ে পুরুষদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করছ! আসলে তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী জাতি’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/৮০-৮১)*।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, لَمْ يَكُنِ اللِّوَاطُ فِي أُمَّةٍ قَبْلَ قَوْمِ لُوطٍ. ‘লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর জাতির আগে কোনো জাতির মধ্যে সমকামিতা ছিল না’।[১]

হাফেয ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘লূত্ব আলাইহিস সালাম ছিলেন হারান ইবনে আযারের পুত্র এবং তিনি ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর ভ্রাতুষ্পুত্র (ভাইয়ের ছেলে)। তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর সঙ্গে ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গেই শামভূমিতে হিজরত করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ‘সাদূম’ (سدوم) নগরবাসী এবং আশপাশের গ্রামসমূহের নিকট নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন, ভালো কাজের নির্দেশ দেন এবং তাদেরকে নিষেধ করেন সেসব পাপকর্ম, হারাম কাজ ও অশ্লীলতা থেকে, যা তারা উদ্ভাবন করেছিল। এমন জঘন্য অপরাধ, যা তাদের আগে আদমসন্তানদের কেউ কখনো করেনি, এমনকি মানুষ ছাড়া অন্যরাও করেনি। আর তা হলো, পুরুষদের সাথে যৌনাচার (সমকামিতা)। এটি এমন এক জঘন্য বিষয় ছিল, যা আদমসন্তানদের কেউ কখনো চিন্তাও করেনি, তাদের মনেও এমন কোনো ভাবনা আসেনি, যতক্ষণ না ‘সাদূম’বাসীরা তা শুরু করেছিল। তাদের উপর আল্লাহর লা‘নত বর্ষিত হোক’।[২]

লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর ঘটনা[৩]:

কুরআনিক ঘটনাগুলোর একটি নিজস্ব উপস্থাপন পদ্ধতি রয়েছে, যা সত্য ঘটনাগুলোকে উপস্থাপন করে এবং চিন্তাগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যেন তা জীবন্তভাবে মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে।

লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর ঘটনা সেই কুরআনিক ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি, যেটি কুরআন বাস্তব রূপে উপস্থাপন করেছে। এই ঘটনার মাধ্যমে কুরআন ঈমানের মূলনীতি, তাওহীদের শিক্ষা এবং নিজেদের ওপর যুলুমকারী ও সৎপথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া লোকদের প্রতি আল্লাহর চিরন্তন নীতির বর্ণনা দিতে চেয়েছে।

লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর ঘটনার সারাংশ:

লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর ঘটনা কুরআনে একাধিক স্থানে এসেছে। এই ঘটনা কখনো বিস্তারিতভাবে, আবার কখনো সংক্ষেপে এসেছে। প্রতিটি সূরায় এটি এমন ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে, যার নিজস্ব বার্তা, প্রভাব ও দিকনির্দেশনা রয়েছে।

লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর ঘটনা যে অঞ্চলে ঘটেছিল, তার নাম ছিল সাদূম (سدوم), যা আজকের দিনে অধিকৃত ফিলিস্তীন ভূমির অন্তর্ভুক্ত। ঘটনার সারমর্ম হলো, লূত্ব আলাইহিস সালাম ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর ভাতিজা। তিনি তাঁর সঙ্গেই শামভূমিতে হিজরত করেন।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে সাদূম এবং আশেপাশের গ্রামবাসীদের কাছে নবী করে পাঠান। তিনি তাঁদের আল্লাহর দিকে ডাকেন, সৎকর্মে উৎসাহিত করেন এবং তাঁদেরকে

* বিএ (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এমএ এবং এমফিল, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. তাফসীর কুরতুবী, ৭/২৪৫।

২. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৩/৪৪৪-৪৪৫।

৩. ইসলামওয়েব (Islamweb) কর্তৃক উপস্থাপিত ঘটনাটির বর্ণনাশৈলি আমাকে মুগ্ধ করেছে। সেজন্য, ঘটনাটি সেখান থেকে উপস্থাপিত হলো। এই লিংক দেখুন: https://www.islamweb.net/ar/article/174503/

সেই অপকর্ম ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকতে বলেন, যা আগে কোনো মানবজাতি বা অন্য কোনো জাতি করেনি। আর সেই জঘন্য পাপ হচ্ছে, সমকামিতা।

কিন্তু লূত্ব আলাইহিস সালাম-এর ক্বওম কিছুতেই তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। ফলে তাদের উপর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নেমে আসে এমন ভয়াবহ আযাব, যা তাদের আগে বা পরে আর কাউকে মহান আল্লাহ দেননি।

ঘটনাটির ধারাবিবরণ:

এই কুরআনিক ঘটনাটিকে বেশ কয়েকটি ধারায় নিম্নরূপভাবে সাজানো যায়:

প্রথমত: লূত্ব আলাইহিস সালাম সাদূমবাসীদেরকে সঠিক দ্বীন ও সোজা পথে আহ্বান করেন। তিনি তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেন তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে। কারণ তাক্বওয়া হলো সমস্ত বিষয়ের মূল ভিত্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ - إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ - إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ - فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾ 'লূত্বের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। যখন তাদের ভাই লূত্ব তাদেরকে বললেন, তোমরা কি তাক্বওয়া অবলম্বন করবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং আমার আনুগত্য করো' *(আশ-শুআরা, ২৬/১৬০-১৬৩)*। তিনি তাদের জানান —যেমনটি অন্যান্য রাসূলও জানিয়েছেন— যে, তিনি একজন বিশ্বস্ত রাসূল এবং তিনি তাঁর দাওয়াতের বিনিময়ে কোনো প্রতিদান চান না। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ 'আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না; আমার প্রতিদান তো শুধু জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট' *(আশ-শু'আরা, ২৬/১৬৪)*।

দ্বিতীয়ত: তিনি তাদেরকে নিষেধ করেন সেই অশ্লীল কাজ থেকে, যা তারা করত এবং যা এর আগে বিশ্বের আর কেউই করেনি। এ কথাটি কুরআন মাজীদের কয়েক জায়গায় বিভিন্নভাবে এসেছে। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ 'আর তোমরা স্মরণ কর লূত্বের কথা, যখন তিনি তার ক্বওমকে বলেছিলেন, তোমরা কি অশ্লীল কাজ করো, যা তোমাদের আগে বিশ্বের কেউ করেনি? *(আল-আ'রাফ, ৭/৮০)*। তিনি আরও বলেন, ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ 'তোমরা দেখে-শুনে কেন অশ্লীল কাজ করছ?' *(আন-নামল, ২৭/৫৪)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, ﴿أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ﴾ 'তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছ, তোমরাই তো রাহাজানি করে থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কাজ করে থাক' *(আল-আন'কাবূত, ২৯/২৯)*।

তৃতীয়ত: লূত্ব আলাইহিস সালাম-এর দাওয়াতের বিপরীতে তাঁর জাতির অবস্থান ছিল প্রত্যাখ্যান, উপহাস, অবজ্ঞা এবং হুমকি ও শাস্তির ভয় প্রদর্শন। কুরআনের বহু আয়াতে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন- মহান আল্লাহ তাদের বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, ﴿أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ 'এদেরকে (লূত্ব আলাইহিস সালাম ও মুমিনদেরকে) তোমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কার করো, এরা তো এমন লোক, যারা অতি পবিত্র হতে চায়' *(আল-আ'রাফ, ৭/৮২)*। তিনি আরও বলেন, ﴿قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ 'তারা বলল, আমরা কি দুনিয়ার সকল লোককে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিষেধ করিনি?' *(আল-হিজর, ১৫/৭০)*। অপর আয়াতে এসেছে, ﴿قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴾ 'তারা বলল, হে লূত্ব! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তুমি বিতাড়িতদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আশ-শূ'আরা, ২৬/১৬৭)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ 'তারা বলল, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি নিয়ে এসো' *(আল-আনকাবূত, ২৯/২৯)*।

লূত্ব আলাইহিস সালাম-এর ক্বওম যা করত, তা গোপনে বা সংকোচ করে নয়; বরং প্রকাশ্যে, দম্ভভরে ও অহংকারে করত। তারা লূত্ব আলাইহিস সালাম যে নির্দেশনা নিয়ে এসেছিলেন, তা অবহেলা ও অবজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে নৈতিকতা, শালীনতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে উপহাস করত।

চতুর্থত: তাঁদের এই বিরোধিতা ও মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার প্রতি লূত্ব আলাইহিস সালাম-এর অবস্থান ছিল নিম্নরূপ:

প্রথমে তিনি তাদের কর্মের প্রতি ঘৃণা ও নিন্দা প্রকাশ করেন। মহান আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে বলেন, ﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ

﴿مِنَ الْقَالِينَ﴾ ‘তিনি বললেন, আমি তো তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি’ *(আশ-শু‘আরা, ২৬/১৬৮)*। এরপর তিনি তাঁর রবের নিকট তাঁর ক্বওমের পাপকর্ম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, ﴿رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾ ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবারকে তাদের কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করুন’ *(আশ-শুআরা, ২৬/১৬৯)*।

পঞ্চমত: লূত্ব আলাইহিস সালাম তাঁর জাতিকে সেই অশ্লীলতা থেকে ফেরানোর জন্য তাদেরকে বিয়ের মাধ্যমে নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে বলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ ‘তিনি বললেন, এই তো আমার কন্যারা, এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র’ *(হূদ, ১১/৭৮)*।

উল্লেখ্য, এখানে ‘আমার কন্যারা’ বলতে বোঝানো হয়েছে তাঁর জাতির নারীরা। কারণ একজন নবী তাঁর জাতির জন্য পিতার মতো। বিখ্যাত মুফাসসির মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ এমনটাই বলেছেন।[৪] যাহোক, তিনি তাদেরকে হালাল পন্থার দিকেই নির্দেশনা দেন। কিন্তু তারা নারীদের প্রতি অনাসক্তি দেখিয়ে বলে, ﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ﴾ ‘তারা বলল, তুমি তো জানো, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই; আমরা কি চাই তা তো তুমি জানোই’ *(হূদ, ১১/৭৮)*।

মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন, أَنَّ الرِّجَالَ كَانُوا قَدِ اسْتَغْنَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، وَكَذَلِكَ نِسَاؤُهُمْ كُنَّ قَدِ اسْتَغْنَى بَعْضُهُنَّ بِبَعْضٍ أَيْضًا. ‘তাদের পুরুষেরা একে অপরকে নিয়ে পরিতৃপ্ত ছিল, অনুরূপভাবে তাদের নারীরাও একে অপরকে নিয়ে পরিতৃপ্ত ছিল’।[৫]

ষষ্ঠত: এই ঘটনার মাঝে আল্লাহ তাআলা কিছু ফেরেশতা পাঠান, যাতে তারা লূত্ব আলাইহিস সালাম-কে সান্ত্বনা দিতে পারেন এবং তাঁর অবস্থানে তাঁকে দৃঢ় রাখতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ ‘তারা বললেন, নিশ্চয় আমরা লূত্বকে ও তার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব, তার স্ত্রীকে ছাড়া; সে তো পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত’ *(আল-আনকাবূত, ২৯/৩৩)*।

এই আসমানী দূতগণ লূত্ব আলাইহিস সালাম-এর ক্বওমের কর্মকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন এবং অনেক যুলুমপূর্ণ কাজ বলে অভিহিত করেন, যার জন্য পীড়াদায়ক আযাব অবশ্যম্ভাবী। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ ‘তারা বলেছিলেন, নিশ্চয় আমরা এ জনপদবাসীকে ধ্বংস করব, এর অধিবাসীরা তো যালেম’ *(আল-আনকাবূত, ২৯/৩১)*। তিনি আরও বলেন, ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ ‘নিশ্চয় আমরা এ জনপদবাসীদের উপর আকাশ হতে শাস্তি নাযিল করব, কারণ তারা পাপাচার করছিল’ *(আল-আনকাবূত, ২৯/৩৪)*।

সপ্তমত: আসমানী হেদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং নবীদের বার্তা নিয়ে উপহাসকারীদের পরিণাম আল্লাহ তা‘আলা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ - فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾ ‘অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করল; তাতে আমরা জনপদটিকে উল্টিয়ে উপর-নিচ করে দিলাম এবং তাদের উপর পোড়ামাটির পাথর-কঙ্কর বর্ষণ করলাম’ *(আল-হিজর, ১৫/৭৩-৭৪)*। তিনি আরও বলেন, ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ - مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ ‘অতঃপর যখন আমাদের আদেশ আসল, তখন আমরা জনপদকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম পোড়ামাটির পাথর, যা আপনার রবের কাছে চিহ্নিত ছিল। আর এটা যালেমদের থেকে দূরে নয়’ *(হূদ, ১১/৮২-৮৩)*।

আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন, তাঁর প্রজ্ঞা এটিই দাবি করে যে, সেই যালেমদের জন্য এমন একটি পরিণতি নির্ধারণ করা হোক, যা পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা ও নছীহত হয়ে থাকবে। তিনি আরও বলেন, ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ‘আর অবশ্যই আমি ঐ জনপদে সুস্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি সে ক্বওমের জন্য, যারা বুঝে’ *(আল-আনকাবূত, ২৯/৩৫)*।

এটি আল্লাহর চিরন্তন নিয়ম যে, তিনি সত্য ও মিথ্যার, ন্যায় ও অন্যায়ের, শালীনতা ও অশ্লীলতার দ্বন্দ্বে সবসময় তিনি তাঁর নবী এবং মুমিনদেরকে রক্ষা করে থাকেন; তেমনি তিনি লূত্ব আলাইহিস সালাম এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান

৪. দ্রষ্টব্য: তাফসীর ত্বাবারী, ১৫/৪১৩-৪১৪।
৫. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৩/৪৪৫।

এনেছিলেন, তাঁদেরকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি বলেন,﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ 'অতঃপর আমরা তাকে ও তার পরিবার-পরিজনের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম, তার স্ত্রী ছাড়া, সে ছিল পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত' *(আল-আ'রাফ, ৭/৮৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন, ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ - إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ﴾ 'তারপর আমরা তাকে এবং তার পরিবার-পরিজন সকলকে রক্ষা করলাম; এক বৃদ্ধ ছাড়া, যে ছিল পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত' *(আশ-শুআরা, ২৬/১৬০-১৭৩)*।

অষ্টমত: এই ঘটনার সমাপ্তি টানা হয়েছে চিন্তা-ভাবনা ও গভীর অনুধাবনের দিকে আহ্বানের মধ্য দিয়ে, যেন মানুষ আসমানী হেদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং আল্লাহর নির্ধারিত প্রকৃতির বিপরীতে চললে কী পরিণতি হয়, তা ভেবে দেখে। নিম্নবর্ণিত আয়াতগুলোতে সেই কথাই প্রধ্বনিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ 'আর আমরা তাদের উপর ভীষণভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। কাজেই দেখুন, অপরাধীদের পরিণাম কীরূপ হয়েছিল' *(আল-আ'রাফ, ৭/৮৪)*। তিনি আরও বলেন, ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ 'এতে অবশ্যই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে' *(আল-হিজর, ১৫/৭৫)*। তিনি অন্যত্র বলেন, ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ 'নিশ্চয়ই এতে মুমিনদের জন্য নিদর্শন রয়েছে' *(আল-হিজর, ১৫/৭৭)*।

লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা:

কুরআনে বর্ণিত লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর ঘটনাতে অন্যান্য কুরআনিক ঘটনার মতোই বহু শিক্ষা ও নছীহত রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো:

১. একজন দাঈ বা আহ্বানকারীর প্রধান দায়িত্ব হলো— মানুষকে আল্লাহভীতির দিকে আহ্বান করা। হিকমতপূর্ণ পদ্ধতিতে সমাজের বিপথগামী ও বিভ্রান্ত মানুষদের সঠিক পথে ফেরানো। দাওয়াত যেন বিনিময় লাভ বা খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে না হয়; বরং তা হওয়া উচিত আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্য।

২. যারা প্রকৃত ঈমানদার, চরিত্রবান এবং আত্মার পবিত্রতা ও মানুষের সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট, তারা নিজেদের জীবন দিয়ে হলেও সত্য দ্বীন ও আল্লাহর আদেশ রক্ষা করেন। লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর ঘটনায় সেটাই আমরা দেখি; তিনি তাঁর ক্বওমকে সঠিক রাস্তায় ফেরানোর ক্ষেত্রে কোনো মাধ্যমই বাকী রাখেননি। তিনি কখনও তাদেরকে তাক্বওয়ার আদেশ দিয়েছেন, ﴿فَاتَّقُوا اللهَ﴾ 'কাজেই তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো' *(হূদ, ১১/৭৮)*। কখনও তাঁর জাতিকে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে সাবধান করেছেন, ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ 'নিশ্চয় তোমরা অশ্লীল কাজ করছ' *(আল-আনকাবূত, ২৯/২৮)*। কখনও সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ 'একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও, তবে আমার এ কন্যারা রয়েছে!' *(আল-হিজর, ১৫/৭১)*। আবার কখনও আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন, ﴿قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ 'তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! বিপথগামী জাতির বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন!' *(আল-আনকাবূত, ২৯/৩০)*।

৩. যদিও লূত্ব আলাইহিস সালাম ছিলেন অত্যন্ত ঈমানদার, দৃঢ়চেতা এবং সাহসী, তবুও তিনি চেয়েছিলেন আরও শক্তি থাকুক, যাতে এই অপরাধীদের বাধা দিতে পারেন। এটি আমাদের শেখায়— একজন দাঈ চাইলে সত্য প্রতিষ্ঠায় এবং মিথ্যা ও অন্যায়কে রোধ করতে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন। মহান আল্লাহর নিচের বক্তব্য থেকে আমরা সেকথাই পাই, ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ 'তিনি বললেন, তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত অথবা যদি আমি আশ্রয় নিতে পারতাম কোনো সুদৃঢ় স্তম্ভের দিকে!' *(হূদ, ১১/৮০)*।

৪. আল্লাহর প্রজ্ঞা অনুযায়ী, অপরাধীদের শাস্তি তাদের অপরাধের ধরন অনুযায়ী হয়। লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর জাতি যেহেতু প্রাকৃতিক নিয়মকে উল্টে দিয়েছিল, সেহেতু আল্লাহও তাদের জনপদ সম্পূর্ণরূপে উল্টে দিয়েছিলেন।

৫. কুরআন মাজীদ লূত্ব আলাইহিস সালাম -এর জাতির অপকর্মের কারণে তাদেরকে তিনটি গুরুতর বিশেষণে বিশেষিত করেছে: ক. ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾ 'বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি' *(আল-আ'রাফ, ৭/৮১)*। খ. ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ 'বরং তোমরা

সীমালঙ্ঘনকারী জাতি’ *(আশ-শুআরা, ২৬/১৬৬)*। গ. ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ ‘তোমরা মূর্খ জাতি’ *(আন-নামল, ২৭/৫৫)*।

এই তিনটি শব্দ একত্রে নির্দেশ করে— তাদের বুদ্ধি বিকৃতি ঘটেছিল। স্বভাবজাতভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তারা নৈতিকতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এমনকি তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যেখানে পৌঁছলে মানুষ পশুর চেয়েও নিচে নেমে যেতে পারে।

উক্ত ঘটনাকেন্দ্রিক দু’টি বিভ্রাট ও তার জবাব:

কুরআনে কারীমে লূত্ব (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা বর্ণনার মাঝে কিছু আয়াতে এমন বক্তব্য এসেছে, যেগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করে কিছু লোক বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে।

প্রথম আয়াত: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ ‘তিনি বললেন, তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত অথবা যদি আমি আশ্রয় নিতে পারতাম কোনো সুদৃঢ় স্তম্ভের দিকে!’ *(হূদ, ১১/৮০)*।

হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, يَرْحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ‘আল্লাহ লূত্ব (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি রহম করুন! তিনি একটি মজবুত খুঁটির আশ্রয় চেয়েছিলেন’।[৬]

কিছু লোক এই হাদীছের ভিত্তিতে মনে করে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লূত্ব (আলাইহিস সালাম)-এর উক্ত উক্তি সম্পর্কে আপত্তি করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াত: মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ﴾ ‘তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা, তোমাদের জন্য এরা পবিত্র’ *(হূদ, ১১/৭৮)*।

কিছু মানুষ মনে করে, লূত্ব (আলাইহিস সালাম) উক্ত উক্তির মাধ্যমে অশ্লীলতার দাওয়াত দিয়েছেন!

বিভ্রাট দু’টির জবাব: এতে তাদের বিভ্রাট ও সংশয়ের পক্ষে কোনো দলীল নেই। বরং তাঁর উভয় উক্তিই হক্ব। কেননা লূত্ব (আলাইহিস সালাম) যা বলেছিলেন, তা ছিল আত্মীয়স্বজন বা ঈমানদার অনুসারীদের সাহায্য দ্বারা এই দুনিয়াতে প্রতিরোধ ও শক্তি কামনা, যার দ্বারা তিনি তার ক্বওমের অশ্লীলতাকে প্রতিরোধ করতে পারেন— যেভাবে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও আনছার-মুহাজিরগণের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছিলেন। লূত্ব (আলাইহিস সালাম) কখনই এটা ভাবেননি যে, তিনি তাঁর রবের চেয়েও শক্তিশালী কারও সাহায্য চাইছেন। আর মানুষের সহযোগিতা চাওয়াতে কোনো দোষ নেই। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ ‘যদি আল্লাহ মানুষকে একে অপরের দ্বারা প্রতিরোধ না করতেন, তবে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৫১)*।

তাই, লূত্ব (আলাইহিস সালাম) যা কামনা করেছিলেন, তা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেও আনছার ও মুহাজির ছাহাবীগণের কাছ থেকে কামনা করেছিলেন, যাতে তিনি আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতে পারেন। তাহলে, লূত্ব (আলাইহিস সালাম)-এর যে কাজটি ছিল, তা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেও করেছেন। অতএব, লূত্ব (আলাইহিস সালাম)-এর এই চাওয়াকে নিন্দা করার কোনো প্রশ্নই আসে না।

আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো লূত্ব (আলাইহিস সালাম)-এর এই কথার ব্যাপারে আপত্তি করেননি। বরং তিনি শুধু এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, লূত্ব (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন, ‘আমি যদি কোনো শক্তিশালী আশ্রয়ের দিকে যেতে পারতাম (ركن شديد)’। আর এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে— ফেরেশতাদের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাহায্য। তবে লূত্ব (আলাইহিস সালাম) তখন জানতেন না যে, ফেরেশতারা ইতোমধ্যেই তাঁকে সাহায্য করতে প্রেরিত হয়েছেন।

আর যে ব্যক্তি মনে করে, লূত্ব (আলাইহিস সালাম) বিশ্বাস করতেন না যে, আল্লাহ তাঁর শক্তিশালী আশ্রয়দাতা, সে প্রকৃতপক্ষে কুফরী করে। কারণ সে একজন নবী (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে এমন ধারণা করছে, যা কুফরী। এমন ধারণা অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ। কারণ যে নবী (আলাইহিস সালাম) নিজের চোখে আল্লাহর নিদর্শন ও অলৌকিকতা দেখেছেন এবং যিনি সারাজীবন আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন, তাঁর সম্পর্কে এমন মনে করা অসম্ভব।

আর দ্বিতীয় আয়াতে ‘আমার কন্যারা’ বলতে বোঝানো হয়েছে লূত্ব (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির নারীরা। কারণ একজন নবী তাঁর জাতির জন্য পিতার মতো।

তিনি তাদের বিয়ের মাধ্যমে হালাল সম্পর্ক স্থাপন করতে বলেন হারাম থেকে বিরত রাখতে। এটা স্পষ্ট যে, একজন নবী (আলাইহিস সালাম) কখনোই কোনো অশ্লীল কাজে দাওয়াত দিতে পারেন না, যেহেতু তিনি নিজেই সেই কাজ থেকে নিষেধ করছেন।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

৬. ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৮৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫১।

আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ: এসো! আল্লাহর পথে...

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(পর্ব-৫)

আল্লাহর নাম ও গুণাবলির গুরুত্ব ও ফযীলত:

কুরআনুল কারীমে সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ আয়াত ও সূরাগুলো মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলিতে পরিপূর্ণ। যেমন- সূরা ইখলাছের ক্ষেত্রে বলা হয়, এটি কুরআন মাজীদের এক-তৃতীয়াংশের সমান তথা কেউ যদি সূরা ইখলাছ একবার পড়ে, তাহলে সে কুরআন মাজীদের এক-তৃতীয়াংশ শেষ করল আর কেউ যদি সূরা ইখলাছ তিনবার পড়ে শেষ করে, তাহলে সে কুরআন মাজীদ সম্পূর্ণটাই শেষ করল। সূরা ইখলাছের মতো ছোট্ট সূরা হওয়ার পরও এত বেশি ফযীলতের কারণ হলো এই সূরাটি মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সমৃদ্ধ একটি সূরা। পুরো সূরাতে শুধু মহান আল্লাহর নাম, গুণাবলি ও পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে।

ঠিক তেমনি আয়াতুল কুরসীর ফযীলত আমরা জানি, কেউ যদি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, তাহলে তার জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র বাধা হলো তার মৃত্যু। কেউ যদি রাতে ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, তাহলে তার শয্যাপাশে একজন ফেরেশতা দায়িত্বরত থাকেন। আয়াতুল কুরসীকে কুরআন মাজীদের সবচেয়ে মহান সূরা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আয়াতুল কুরসীর এত বিশাল ফযীলতের অন্যতম কারণ হচ্ছে- এই আয়াতটি মহান আল্লাহর নাম, গুণাবলি ও পরিচয় সমৃদ্ধ।

আল্লাহর নামের এত ক্ষমতা যে, শুধু আল্লাহর নামে শয়তান মাছির মতো ক্ষুদ্র হয়ে পলায়ন করে। শুধু আল্লাহর নামে যবেহকৃত প্রাণী হালাল হিসেবে গণ্য হয়। শুধু আল্লাহর নামে কোনো কিছু করলে, যেমন- খাবার গ্রহণ করলে, সেটি বরকতময় হয়। আল্লাহর নাম উচ্চারিত না হলে, খাবারে শয়তান অংশগ্রহণ করে, বাড়িতে শয়তান বসবাস করে।

দুনিয়াতে তাসবীহ ও যিকিরের ক্ষেত্রে যত ধরনের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তার সবই আল্লাহর নাম ও গুণের ফযীলত। কেননা তাসবীহ ও যিকির মূলত আল্লাহর নামের উচ্চারণ, আল্লাহর বড়ত্ব, মাহাত্ম্য ও বিভিন্ন গুণাবলির স্বীকৃতি।

মহান আল্লাহর ৯৯টি নাম কেউ যদি আয়ত্ত করে নেয়, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

দলীলসমূহ:

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহর ৯৯টি নাম রয়েছে, ১০০ থেকে ১ কম; যে ব্যক্তি এগুলো হিফয করে (মুখস্থ, অনুধাবন ও আমল করে), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১] রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ। 'যে ব্যক্তি ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই বাধা দিতে পারে না'।[২] রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ ٱلْقُرْآنِ 'সূরা ইখলাছ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য'।[৩] রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ، فِي الْأَرْضِ، وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ 'যে ব্যক্তি তিনবার বলবে, بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ অর্থাৎ আমি মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি, যার নাম থাকলে আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই আমার কোনো ক্ষতি পারবে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। এই দু'আ তিনবার পড়লে সে হঠাৎ ক্ষতির সম্মুখীন হবে না'।[৪]

আল্লাহর নামের ইবাদত:

আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, আল্লাহর নাম আয়ত্ত করার ফযীলত। অনেকেই মনে করে শুধু নাম মুখস্থ করলেই সে ফযীলত পাওয়া যাবে, কিন্তু এটি ভুল ধারণা। শুধু নাম মুখস্থ করলেই হবে না, বরং সেই নামের উপর ইবাদত করাও জানতে হবে। আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ইবাদতই মূলত আল্লাহর নাম ও গুণাবলিকে আয়ত্ত করা। আমরা কয়েকভাবে মহান আল্লাহর নামের উপর ইবাদত করতে পারি।

মুখস্থ করা ও সেই নামে দু'আ করা:

ইবাদতের প্রথম স্তর হচ্ছে আল্লাহর নামগুলো মুখস্থ করা। কেননা মুখস্থ না করলে নামগুলো কোনো কাজেই লাগানো যাবে না। মুখস্থ করার পর নামের অর্থগুলো বুঝার চেষ্টা করতে হবে। নামের অর্থগুলো বুঝলে সেই অনুযায়ী মহান

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

১. ছহীহ বুখারী, হা/২৭৩৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৭৭।
২. নাসাঈ, হা/৯৯২, 'হাসান'; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১৫৯৫।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫০১৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৮১১।
৪. আবূ দাঊদ, হা/৫০৮৮; তিরমিযী, হা/৩৩৮৮, 'হাসান ছহীহ'।

আল্লাহর নিকট এই সমস্ত নাম ব্যবহার করে দু'আ করতে হবে। যেমন- কারো যদি রিযিকের দরকার হয়, তাহলে সে বলবে, হে রাযযাক! আপনি আমাকে রিযিক দেন; কারো যদি ক্ষমার দরকার হয়, তাহলে সে বলবে, হে গাফফার! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন; কারো যদি দয়ার দরকার হয়, তাহলে সে বলবে, হে রহমান! হে রহীম! আমাদের উপর দয়া করুন; হে মুগীছ! বিপদ থেকে উদ্ধারকারী! আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুন! এভাবে নামের অর্থের সাথে মিল রেখে সেই সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয় চাওয়ার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর সেই নামের অসীলা দিয়ে দু'আ করতে হবে।

আল্লাহর রঙে রঙিন হওয়া:

আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ইবাদতের অন্যতম আরেকটি বিষয় হচ্ছে আল্লাহর নাম ও গুণাবলির প্রভাব নিজের জীবনে প্রতিফলিত করা। আর এটি দুইভাবে হতে পারে— প্রথমত, আল্লাহর নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী নিজের স্বভাব-চরিত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসা। যেমন- মহান আল্লাহ সবকিছু শুনেন— এই গুণে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা কল্পনা করব, মহান আল্লাহ যেহেতু আমাদের সকল কথা শুনছেন, সেহেতু আমি যদি কোনো অশ্লীল কথা বা মিথ্যা কথা বলি সেটিও তিনি শুনবেন। অতএব, আমি আজ থেকে আর মিথ্যা বা অশ্লীল কথা বলব না। আল্লাহর গুণাবলিকে সবসময়ের জন্য স্মরণে রেখে নিজের জীবনযাপনের পদ্ধতিতে এই ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসাই আল্লাহর নামের ইবাদত। ঠিক তেমনি মহান আল্লাহ সবকিছু দেখেন। অতএব, রাতের অন্ধকারে বা লোকচক্ষুর আড়ালে কোনো কিছু করলে সেটি আল্লাহর দৃষ্টির আড়াল হয় না। তাই মহান আল্লাহর এই গুণকে সামনে রেখে যখন আমরা গোপন গুনাহ পরিত্যাগ করি, তখনই সেটি হয় মহান আল্লাহর গুণের ইবাদত।

দ্বিতীয়ত, মহান আল্লাহর যে গুণগুলো মানুষের জন্য অর্জন করা সম্ভব, সে গুণগুলো অর্জন করার চেষ্টা করা। যেমন- মহান আল্লাহ দয়ালু, মানুষেরও উচিত দয়া করার চেষ্টা করা। মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল, মানুষেরও উচিত ক্ষমা করার চেষ্টা করা। মানুষ যখন মানুষকে ক্ষমা করতে শিখবে, তখন মহান আল্লাহ তাকে এমনিতেই ক্ষমা করে দিবেন। মানুষ যখন সকল সৃষ্টির উপর দয়া করতে শিখবে, তখন মহান আল্লাহও তার উপর দয়া করবেন। মানুষ যখন অন্যের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার দায়িত্ব নিবে, তখন মহান আল্লাহ তাকে আরও বেশি রিযিক দিবেন। মানুষ যখন অন্যের দোষ দেখার পরও সেটি ঢেকে রাখবে, তখন আল্লাহ তাআলাও মানুষের দোষ ঢেকে রাখবেন, তাকে অপমানিত করবেন না। এভাবে আল্লাহর রঙে রঙিন হওয়াও মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ইবাদত।

দলীলসমূহ:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ...

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দু'আর মধ্যে বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার সেই সকল নামের অসীলা প্রার্থনা করছি, যেসব তুমি নিজের জন্য রেখেছ অথবা তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছ অথবা তোমার কোনো বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছ অথবা তোমার কাছে গায়েবী জ্ঞানে সংরক্ষিত রেখেছ...'।[৫]

ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, العبادة بأسماء الله نوعان والثاني: التعبد بمقتضاها، أحدهما: دعاؤه بها وطلب الحاجات منها: فالعليم يعبد بأن يعلمه العبد، ويوقن بعلمه، ويراقب الله... অর্থাৎ আল্লাহর নামের মাধ্যমে দুটি পদ্ধতিতে ইবাদত হয়— ১. ওই নাম দিয়ে আল্লাহকে ডাকা ও চাওয়া। যেমন- ইয়া রহীম, ইয়া রহমান। ২. ওই নামের প্রভাব অনুযায়ী আমল করা। যেমন- আল-আলীম নাম জানলে ব্যক্তি সতর্ক ও সচেতন থাকবে, কারণ আল্লাহ সবকিছু জানেন।[৬]

আল্লাহ নামে ইলহাদ কাবীরা গুনাহ:

ইলহাদ মূলত চার প্রকার—

১. আল্লাহর কোনো নাম অথবা তাঁর অন্তর্নিহিত গুণ ও নির্দেশ অস্বীকার করা। যেমন- একদল মানুষ মহান আল্লাহর আসমানে আরশে ওঠাকে অস্বীকার করে।

২. আল্লাহর নামকে সৃষ্টির গুণের সাথে তুলনা করা (তাশবীহ)। মনে রাখতে হবে, মানুষও শ্রবণ করে, আল্লাহও শ্রবণ করেন; তবে আল্লাহর শ্রবণ সম্পূর্ণ ভিন্ন, যা ধারণা করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

৩. আল্লাহকে এমন নামে ডাকা, যা তিনি নিজেকে বলেননি, যেমন- খ্রিষ্টানরা আল্লাহকে 'পিতা' (الأب) বলে ডাকে, দার্শনিকরা আল্লাহর নাম দিয়েছে 'কার্যকারণের সৃষ্টিকর্তা' (العلة الفاعلة)। আল্লাহর নামসমূহ তাওক্বীফী অর্থাৎ শুধু কুরআন ও হাদীছ দ্বারা নির্ধারিত। নিজের পক্ষ থেকে কোনো নাম আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা বিকৃতি ও সীমালঙ্ঘন।

৪. আল্লাহর নাম থেকে অন্য কারো নামকরণ করা। যেমন- العزيز (আল-আযীয) থেকে মূর্তির নাম বানানো العزى (আল-উযযা), الإله (আল্লাহ) থেকে বানানো اللات। ঠিক তেমনি কারো নাম গাউছুল আ'যম, মুশকিল কুশা, শাহজাহান রাখা।

(ইন-শা-আল্লাহ চলবে)

---

৫. ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৯৭১।

৬. বাদাইউল ফাওয়ায়েদ, ১/১৬৩-১৬৪।

মসজিদের আদব-কায়দা বিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল

-ড. আবুল কালাম আযাদ*

মসজিদ আল্লাহর ঘর এবং এটি ইবাদত ও সামাজিক কার্যকলাপের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। আল্লাহ তাআলার যমীনে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ জায়গা হলো আল্লাহর ঘর তথা মসজিদ। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا 'আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হলো মসজিদসমূহ আর সবচেয়ে খারাপ জায়গা হলো বাজারসমূহ'।[১]

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের জন্য মুমিন বান্দাগণ মসজিদে যান। আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা মসজিদের আদব-কায়দা বিষয়ে আমাদের উদাসীনতা এবং কম জানার কারণে আমরা অনেক ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হচ্ছি অথবা অনেক ক্ষেত্রে গুনাহগার হয়ে যাচ্ছি। পূতপবিত্র হয়ে সুন্দর পোশাকে মসজিদে যাওয়ার কথা থাকলেও আমরা যেকোনো পোশাকেই মসজিদে চলে যাচ্ছি। কখনো কখনো পোশাকে নানা ধরনের লেখা বা ছবি অন্যের ছালাতে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। দু'আ পড়ে ঘর থেকে বের হওয়া এবং পথে যেতে যেতেও দু'আ পড়ার নিয়ম আছে। ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা, বাম পা দিয়ে বের হওয়া এবং দু'আ পাঠ করা মসজিদের অন্যতম আদব ও আমল। মসজিদে প্রবেশের পর দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদের ছালাত আদায় করে বসার বিধান থাকলেও না জানার কারণে অনেকেই মসজিদে প্রবেশের পর প্রথমে বসে যায় এবং পরে ছালাত আদায় করে। ফরয ছালাত খুশূ-খুযূ (বিনয়, নম্রতা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও তন্ময়তা) সহকারে জামাআতে আদায় করার ছওয়াব ২৭ গুণ বেশি।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُمِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত তার ছালাত আদায়ের স্থানে বসে থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার জন্য দু'আ করতে থাকেন। তার ওযূ নষ্ট হওয়া অথবা উঠে চলে যাওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাগণ এই বলে দু'আ করতে থাকেন, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করুন'।[২] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীছে বলা হয়েছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ 'তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে নিবে। কেননা কাতার সোজা করা ছালাত প্রতিষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত'।[৩]

মোবাইল ফোনের যন্ত্রণায় এখন মসজিদে মুছল্লীরাও অতিষ্ঠ। মসজিদের ভিতর 'মোবাইল ফোন বন্ধ রাখুন' সংবলিত সাইনবোর্ড দিয়েও কাজ হচ্ছে না। অন্যের অসুবিধার কথা চিন্তা না করে কেউ কেউ আবার জোরে জোরে যিকির-আযকার করছেন। অথচ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী কাউকে কষ্ট দেওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। এমতাবস্থায় অধিকতর প্রচারের নিমিত্তে মসজিদের আদব-কায়দা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু আমল আগ্রহী মুছল্লীদের জন্য সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

মসজিদের আদব-কায়দা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ আমলসমূহ:

(১) উত্তম পোশাকে মসজিদে যাওয়া *(আল-আ'রাফ, ৭/৩১)*।

(২) বাড়ি থেকে ওযূ করে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়া।[৪]

(৩) মসজিদে কিছু সময় অবস্থান করার নিয়্যত থাকলে নফল ই'তিফাকের নিয়্যতে মসজিদে প্রবেশ করা।[৫]

(৪) মসজিদে যাওয়ার আগে কাঁচা রসুন-পেঁয়াজ না খাওয়া, মিসওয়াক করা এবং দুর্গন্ধ মুক্ত হয়ে যাওয়া।[৬]

(৫) তাড়াহুড়ো না করে ধীরস্থিরভাবে মসজিদে গমন করা।[৭]

(৬) মসজিদের প্রবেশ ও বের হওয়ার পথসমূহ যেকোনোভাবে প্রতিবন্ধকতামুক্ত রাখা।[৮]

(৭) ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা, বাম পা দিয়ে বের হওয়া এবং দু'আ পাঠ করা।[৯]

(৮) মসজিদে প্রবেশের পর দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল মাসজিদের ছালাত আদায় করে তারপর বসা।[১০]

(৯) জায়গা খালি থাকলে প্রথম কাতারে বসা।[১১]

(১০) আযানের উত্তর দেওয়া, তারপর দরূদ পাঠ করা এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্য অসীলার দু'আ করা।[১২]

(১১) জামাআত দাঁড়িয়ে গেলে আর কোনো সুন্নাতের নিয়্যত না করা।[১৩]

(১২) মসজিদে অবস্থানকালে মোবাইলের নানাবিধ ও অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার সীমিত রাখা এবং অন্যের বিরক্তি বা কষ্টের কারণ না হওয়া।[১৪]

---

* সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি, ঢাকা ও সাবেক মহাপরিচালক, বিএআরআই, গাজীপুর।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭১।
২. আবূ দাঊদ, হা/৪৬৯।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/৭২৩।
৪. আবূ দাঊদ, হা/৫৬২।
৫. আদ-দুররুল মুখতার, ১/৪৪৫; আল-মাজমূ, ৬/৪৮৯; আল-ইনছাফ, ৭/৫৬৬।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৮৫৫।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৬৩৬।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/২৪৬৫।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/১৬৮।
১০. ছহীহ বুখারী, হা/১১৬৩।
১১. ছহীহ বুখারী, হা/৬১৫।
১২. ছহীহ বুখারী, হা/৬১৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৮৪, ৩৮৫; আবূ দাঊদ, হা/৫২৫।
১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৭১০।
১৪. মুসনাদ আহমাদ, হা/১৬৮১৯।

(১৩) জুমআর দিন মসজিদে যাওয়ার আগে উত্তমরূপে গোসল করা, মিসওয়াক করা, ওযূ করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা।[১৫]
(১৪) জুমআর দিন মসজিদে অবস্থানকালে জায়গা ফাঁকা না রেখে বসা ও ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে না যাওয়া।[১৬]
(১৫) জুমআর দুই খুৎবার সময় চুপ থাকা ওয়াজিব।[১৭]
(১৬) ইমামের ঠিক পিছনে প্রথমে ডানে ও পরে বামে এভাবে পর্যায়ক্রমে দাঁড়িয়ে প্রথম কাতার পূর্ণ করা। একইভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং অন্যান্য কাতার পূর্ণ করা।[১৮]
(১৭) ফরয ছালাতে কাতার সোজা করা, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো[১৯] এবং মোবাইল বন্ধ রাখা।
(১৮) খুশূ-খুযূ (বিনয়, নম্রতা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও তন্ময়তা) সহকারে জামাআতে ছালাত আদায় করা।[২০]
(১৯) ফরয ছালাতের পর কিছু সময় সেখানে বসে অবস্থান করা, অন্যদের বের হতে সুযোগ দেওয়া ও সম্ভব হলে সুন্নাত ছালাতের জন্য স্থান পরিবর্তন করা।[২১]

১৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৮১৩।
১৬. ইবনু মাজাহ, হা/১১১৫; আবূ দাঊদ, হা/১১১৮।
১৭. ছহীহ মুসলিম, হা/৭১৩।
১৮. মিশকাত, হা/১১০৭, ১০৯৪।
১৯. ছহীহ বুখারী, হা/৭১৯।
২০. ছহীহ বুখারী, হা/৭৪১, ৭৪২, ৬৪৫।
২১. ছহীহ বুখারী, হা/৮৩৭; আবূ দাঊদ, হা/৪৬৯, ১০০৬।

(২০) মসজিদে অবস্থানকালে নীরবে-নিঃশব্দে বা চুপিসারে যিকির-আযকার করা, দু'আ করা এবং সুন্নাত বা নফল ছালাত আদায় করা।[২২]
(২১) মসজিদে অবস্থানকালে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা ও ছালাত চলাকালীন সময়ে সশব্দে কিতাব পাঠ করা থেকে বিরত থাকা।[২৩]
(২২) মসজিদে বসে অহেতুক দুনিয়াবী কথাবার্তায় মাশগূল হওয়া থেকে বিরত থাকা।[২৪]
(২৩) মসজিদ সর্বদা পাক-পবিত্র রাখা এবং ওযূখানা, টয়লেট ও মসজিদ সংলগ্ন এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। পাক-পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক।[২৫]
(২৪) ছালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা নিষেধ।[২৬]
(২৫) মসজিদে অবস্থানকালে কোনোভাবেই অন্যের বিরক্তির বা কষ্টের কারণ না হওয়া এবং সর্বোচ্চ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখা। কাউকে কষ্ট দেওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ।[২৭]

২২. আল-আ'রাফ ৭/৫৫; ইবনু মাজাহ, হা/৮০০।
২৩. আবূ দাঊদ, হা/১৩৩২।
২৪. বায়হাক্বী, হা/৪৫০৭।
২৫. ছহীহ বুখারী, হা/৪৫৮।
২৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫১০।
২৭. মুসনাদ আহমাদ, হা/১৬৮১৯।

ছোট স্বপ্ন নয়, মহৎ উদ্দেশ্যের পথে

-সায়্যিদ তাসনীম আল আমান*

মানুষের স্বপ্ন তার জীবনের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে। কিন্তু যদি স্বপ্ন ছোট হয় এবং কেবল জনমহলের প্রশংসা বা অল্প কিছু ভালো কথার জন্য হয়, তবে তা কোনো মূল্য বহন করে না। এমন স্বপ্ন কখনো জাতি ও দ্বীনের কল্যাণে ফলপ্রসূ হতে পারে না। ইসলামের শিক্ষায়, একজন মুসলিমের স্বপ্ন হতে হবে বড় ও মহৎ উদ্দেশ্যে নিবেদিত, যাতে তার সময় ও জীবন সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারে বিনিয়োগ হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমাদের জীবন হতে হবে উদ্দেশ্যমূলক এবং মহৎ। তিনি বলেন, ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ 'তোমরা হালকা বা ভারী হয়ে অভিযানে বের হয়ে পড়ো এবং তোমাদের সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করো' *(আত-তওবা, ৯/৪১)*।

এই আয়াত নির্দেশ করে যে, আমাদের প্রচেষ্টা কখনো হালকা বা তুচ্ছ হওয়ার নয়; বরং আমাদের শক্তি, সময় ও সম্পদ সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগাতে হবে। বিখ্যাত মুফাসসির যেমন ইবনে কাছীর, কুরতুবী ও সা'দীর মতে, 'হালকা-ভারী' অর্থ-মানুষ যেকোনো অবস্থায় থাকুক না কেন, দ্বীনের কাজে সজাগ ও উদ্যমী হতে হবে। তরুণ কিংবা বৃদ্ধ, ধনী কিংবা গরীব, সুস্থ কিংবা অসুস্থ, সবাই দ্বীনের দায়িত্বে সমান। এই আয়াত আমাদের শেখায় যেকোনো পরিস্থিতিতেই অজুহাত ছাড়াই দাওয়াত ও দ্বীনের কাজে সক্রিয় থাকা আবশ্যক, শুধু সামান্য স্বার্থ বা সমর্থনের আশায় সীমাবদ্ধ থাকা যাবে না।

সক্ষমতা অনুযায়ী, যতক্ষণ শরীর ও মন সাহসী, হাত কর্মঠ এবং মুখে বল আছে, ততক্ষণ দ্বীনের কাজে অংশ নিতে হবে। কোনো অবস্থাতেই দায়িত্ব থেকে পালানো উচিত নয়। বড় স্বপ্ন থাকলে চেষ্টাও বড় হয়। মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে সাব্যস্ত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, فإذا سَألتُم اللهَ فاسألوه الفِردَوسَ 'যখন তোমরা আল্লাহর কাছে কিছু চাইবে, তখন জান্নাতুল ফেরদাউস চাও'।[১] এই হাদীছ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ছোট স্বপ্ন নয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও মহৎ লক্ষ্যই আমাদের প্রেরণার উৎস হতে পারে। আবার হাসান ইবনে আলী ইবনে আবূ তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে সাব্যস্ত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا 'আল্লাহ তাআলা উচ্চ মর্যাদার ও সম্মানজনক কাজগুলোকে ভালোবাসেন এবং তুচ্ছ কাজ অপছন্দ করেন'।[২] অনুরূপ আরও একটি হাদীছে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে সাব্যস্ত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন। তিনি মহৎ ও উচ্চতর কাজগুলোকে পছন্দ করেন এবং তুচ্ছ ও নিচু মানসিকতার কাজগুলোকে অপছন্দ করেন'।[৩]

উক্ত হাদীছগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ মহৎ চিন্তা, উচ্চ আদর্শ ও সম্মানজনক কাজকে পছন্দ করেন। তিনি চান মানুষের জীবনেও সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা ও শালীনতা থাকুক। তুচ্ছ, অর্থহীন বা হীন কাজ যেমন অহেতুক তর্ক, সংকীর্ণ মনোভাব আল্লাহ অপছন্দ করেন। এজন্য মহৎ চরিত্র ও উৎকর্ষতা অর্জনে আমাদের সর্বদা চেষ্টা করতে হবে।

ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যারা মানসিক সততা নিয়ে কাজ করে, তারা সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌঁছানোর চেষ্টা করে এবং তুচ্ছতায় সন্তুষ্টি ত্যাগ করে। 'علو الهمة' গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইসমাঈল আল-মুক্বাদ্দাম উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবুল ফারাজ আল-জাওযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, مَنْ أَعْمَلَ فِكْرَةَ الصَّافِي دَلَّهُ عَلَى طَلَبِ أَشْرَفِ الْمَقَامَاتِ وَنَهَاهُ عَنِ الرِّضَا بِالنَّقْصِ فِي كُلِّ حَالٍ 'যে ব্যক্তি তার মনের সততা কাজে লাগায়, সেটা তাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জনের দিকে চালিত করে এবং কোনো অবস্থাতেই তুচ্ছতায় সন্তুষ্ট হতে দেয় না'।[৪]

কবি আবূ তাইয়্যিব আল-মুতানাব্বী বলেন,

وَلَمْ أَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ عَيْبًا *** كَنَقْصِ الْقَادِرِينَ عَلَى التَّمَامِ

'মানুষের সবচেয়ে বড় ভুল হলো সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পরিপূর্ণতার জন্য চেষ্টা না করা'।[৫]

ইবনুল জাওযী আরও উল্লেখ করেছেন যে, মানুষ যদিও আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে, তবুও শুধু মাটিতে থেকেই খুশি থাকা তার সীমাবদ্ধতারই লক্ষণ। যেমন নবুঅত এমন কিছু নয় যা পরিশ্রম করে অর্জন করা যায়। কিন্তু যদি সেটা সম্ভব হতো, তাহলে যারা পরিশ্রমে পিছিয়ে থাকে, তাদের ব্যর্থতা আরও স্পষ্ট হতো। যেহেতু নবুঅত এখন অর্জনের বাইরে, তাই মানুষের উচিত, জীবনের যেসব বড় অর্জন সম্ভব, তা অর্জনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। উঁচুতে ওঠার প্রেরণার জন্য ইবনুও জওযীর চোখে মানুষের পূর্ণতা ছিল অন্যতম একটা বিষয়। কয়েকটি বিষয়ে তার আলোচনা তুলে ধরা হলো।

* নির্বাহী সম্পাদক, ত্রৈমাসিক কিশলয়; শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. তিরমিযী, হা/২৫৩০।

২. আল-মুজামুল কাবীর, ৩/১৩১।

৩. আল-মুজামুল আওসাত্ব, হা/৬৯০৬।

৪. সিলসিলাতু উলূইল হিম্মাহ, ৩/৪।

৫. শারহু মাআনি শে'রিল মুতানাব্বি লি ইবনে ইফলিলী, দ্বিতীয় যাত্রা, ১/১৬৩।

১. বাহ্যিক সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা: জন্মগত চেহারা হয়তো বদলানো যায় না, কিন্তু নিজের যত্ন নেওয়া জরুরী। শরীর, পোশাক ও চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখা শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়; এটি মনের ভেতরের শৃঙ্খলা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষারও একটি অংশ। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জীবন ছিল এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ, যেখানে সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতার কোনো কমতি ছিল না। শরীআতও আমাদের পরিচ্ছন্ন থাকা এবং নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের কথা বলে।

২. আত্মসম্মান ও উচ্চ মনোভাব: নিজেকে ছোট বা তুচ্ছ ভাবা উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। কিছু ছূফী চিন্তাধারা মানুষকে নিজেদের ছোট ভাবতে শেখায়, যা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার মতে, আত্মোপলব্ধি ও উচ্চ মনোবলই সাফল্যের চাবিকাঠি। নিচু মন কখনো বড় কিছু অর্জন করতে পারে না। তবে সেজন্য যেন মনে অহংকারে উদয় না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

৩. অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা: অন্যের ওপর নির্ভর করা নয়, বরং নিজের হাতে রোজগার করে স্বাবলম্বী হওয়ার ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ, 'উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম'। এর অর্থ হলো- অন্যের সাহায্য নেওয়ার চেয়ে নিজে উপার্জন করে দান করা অনেক বেশি সম্মানের।

৪. জ্ঞান ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ: জ্ঞান অর্জনে অন্ধ অনুকরণ (তাক্বলীদ) ত্যাগ করতে হবে। প্রকৃত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি অন্যের দেখানো পথে না চলে বরং নিজের বুদ্ধি ও বিচার দিয়ে সর্বোচ্চ জ্ঞান ও মর্যাদা লাভের চেষ্টা করে। যারা শুধু অনুকরণ করে, তারা কখনোই সফলতার শিখরে পৌঁছতে পারে না।

৫. সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা: ইবনু জওযীর মতে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এমন হওয়া উচিত যে, কোনো মহৎ গুণ বা মর্যাদার কথা শুনলে নিজের মধ্যেও সেই গুণ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। যেমন, যখন সে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণীটি শোনে, 'আমার উম্মতের মধ্যে ৭০ হাজার ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে', তখন তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা লাফিয়ে ওঠে, যেন সেও তাদের একজন হতে পারে। তিনি বিশ্বাস করেন, অলসতা পরিহার করে শ্রেষ্ঠদেরও ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। মনের এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনেকটা ফুটন্ত জলের মতো, যা ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে তোলে।

সেজন্য আমাদের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য বিষয় অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। এটি শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনের সব ক্ষেত্রেও। যেমন, নিজের স্বাস্থ্য, পেশাদারি দক্ষতা, জ্ঞান অর্জন বা সামাজিক কল্যাণের ক্ষেত্রেও আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে পারি।

ইমাম আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেছেন, 'পা মাটিতে রাখ, স্বপ্ন আকাশে দূরে'। অর্থাৎ, বাস্তবসম্মত জীবনযাপন করুন, কিন্তু আপনার লক্ষ্য হোক মহৎ। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়া জীবন সংকীর্ণ হয় এবং ছোট স্বপ্নে সময় নষ্ট হয়। জীবনকে অর্থপূর্ণ করতে হলে স্বপ্ন বড় হতে হবে, উদ্দেশ্য মহৎ হতে হবে এবং প্রতিটি প্রচেষ্টা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা উচিত। তিনি বলছেন,

إِذا أَظمَأَتكَ أَكُفُّ الرِجالِ   كَفَتكَ القَناعَةُ شبعاً وَريّا
فَكُن رَجُلاً رِجلُهُ في الثَرى   وَهامَةُ هِمَّتِهِ في الثُرَيّا
أَبِيّاً لِنائِلِ ذي ثَروَةٍ   تَراهُ لِما في يَدَيهِ أَبِيّا
فَإِنَّ إِراقَةَ ماءَ الحَياةِ   دونَ إِراقَةِ ماءِ المُحَيّا

'যদি মানুষের হাতে পিপাসা জাগে,
তবে সন্তুষ্টি তৃষ্ণা-ক্ষুধা মেটাবে।
হও এমন মানুষ, পা মাটিতে থাকে,
তবু তোমার স্বপ্ন তারাদেরও ডাকে।
ধনীর দানেতে মাথা নত করো না,
ধনের টানে থেকো উদাস, গর্বে দৃঢ় না।
কারণ জীবনের সম্মান হারানো,
মুখের লজ্জার চেয়ে কঠিনতর জানো'।[৬]

যদি অন্যের কাছে কিছু চাওয়ার কারণে তোমার মনে পিপাসা জাগে, তবে মনে রেখো, তোমার সন্তুষ্টিই তোমাকে তৃপ্ত করবে। এছাড়াও, আমাদের প্রাচীন উলামায়ে কেরামের হিকমতের অনুসরণ করলে দেখা যায়, ছোট স্বপ্নে মানুষ তার শক্তি অপচয় করে। কিন্তু যারা উচ্চ লক্ষ্য স্থাপন করে, তারা সর্বোচ্চ সক্ষমতা এবং কল্যাণমূলক কাজের দিকে এগোতে পারে। যেমন একজন ব্যবসায়ী বা শিক্ষার্থী যদি শুধু সামান্য সফলতার জন্য চেষ্টা করে, তার সম্ভাবনা সীমিত থাকে। কিন্তু যদি সে সর্বোচ্চ জ্ঞান, কল্যাণ বা ন্যায়ের জন্য প্রচেষ্টা চালায়, সে নিজেকে এবং সমাজকে উঁচু পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।

আমরা এমন জীবনযাপন করতে চাই, যেখানে প্রতিটি প্রচেষ্টা অর্থবহ। স্বপ্নকে ছোট না করে বড় রাখুন, উদ্দেশ্যকে মহৎ করুন। এমন জীবন তৈরি করুন, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সমাজের কল্যাণে পূর্ণ। আপনার সময়কে ব্যর্থতায় না কাটিয়ে, প্রতিটি মুহূর্তকে মহৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করুন।

ছোট স্বপ্ন ও তুচ্ছ উদ্দেশ্য কখনও জীবনের প্রকৃত কল্যাণ আনতে পারে না। কুরআন, হাদীছ ও আলেমদের বাণী স্পষ্টভাবে শেখায়, স্বপ্ন বড়, উদ্দেশ্য মহৎ এবং প্রচেষ্টা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। এটি আমাদের জীবনকে অর্থপূর্ণ করে, আমাদের মনোবল ও সক্ষমতাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে আসে।

সুতরাং জীবনকে ছোট স্বপ্নে সীমাবদ্ধ না রেখে, দ্বীনের সেবা ও জাতির কল্যাণে উঁচু লক্ষ্য স্থাপন করাই প্রকৃত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি।

---

৬. সায়দুল আফকার ফিল আদাব ওয়াল আখলাক ওয়াল হিকাম ওয়াল আমছাল, লি হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ আল-মাহদী, ২/৩০১।

দাওয়াত ও তাবলীগ

*-শাহাদাত হোসেন সামি**

ভূমিকা:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ ‘তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে’ *(আলে ইমরান, ৩/১০৪)*। মানবজাতি সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ জাতি হওয়া সত্ত্বেও যখন স্রষ্টাকে ভুলে সৃষ্টির উপাসনা শুরু করে, তখন আল্লাহ তাআলা পথভ্রষ্ট জাতির হেদায়াতের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন শুধু দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করার জন্য। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ ‘আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন করে রাসূল প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো আর তাগূত বা শয়তান থেকে দূরে থাকো’ *(আল-নাহল, ১৬/৩৬)*।

দাওয়াত শব্দটি আরবী, এর মূলধাতু হচ্ছে دعو- যার শাব্দিক অর্থ আহ্বান করা, ডাকা, আমন্ত্রণ জানানো ইত্যাদি। যারা আহ্বান করে, তাদেরকে দাঈ বা দাওয়াতদাতা বলা হয়। তাবলীগ শব্দটিও আরবী, এর মূলধাতু হচ্ছে بلغ- যার শাব্দিক অর্থ পৌঁছে দেওয়া বা প্রচার করা। যিনি পৌঁছে দেন, তাকে মুবাল্লিগ বলা হয়।

আর আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার অর্থ ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে সর্বশেষ অহীর পথে আহ্বান করা। যার মূল উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। অতএব, নিঃশর্তভাবে কেবল কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে দাওয়াতই মানুষকে সঠিক হেদায়াত ও মুক্তির পথ দেখাতে পারে। আর এ দাওয়াত ও তাবলীগের সর্বপ্রথম দায়িত্ব পালন করেছেন আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূলগণ। তাদের মৃত্যুর পরে এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আলেমসমাজের প্রতি।

দাওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

সকল কাজেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ‘আমি মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমারই ইবাদতের জন্য’ *(আয-যারিয়াত, ৫১/৫৬)*। অনুরূপভাবে আল্লাহর পথে দাওয়াত ও তাবলীগ করার পেছনে কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। যথা—

(১) মানুষকে অন্ধকার ও গোমরাহী থেকে হেদায়াত ও আলোর পথে নিয়ে যাওয়া: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ ‘আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের অভিভাবক, তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৫৭)*।

(২) মানুষের আক্বীদা ও আমল ছহীহ ও বিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা: আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ ‘আমরা তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দিব’ *(আল-ফুরক্বান, ২৫/২৩)*।

(৩) মানুষকে জাহান্নামের পথ থেকে জান্নাতের পথে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া: আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর’ *(আত-তাহরীম, ৬৬/৬)*।

আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার নিয়ম ও পদ্ধতি:

(১) হিকমত অবলম্বন করা: দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য সবচেয়ে যে জিনিসটি বেশি প্রয়োজন, তা হলো হিকমত ও কৌশল অবলম্বন করে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া। যাতে মানুষ সহজে দাওয়াত গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ ‘আপনি মানুষকে দাওয়াত দিন আপনার রবের পথে হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা’ *(আন-নাহল, ১৬/১২৫)*।

(২) নম্রতার সাথে কথা বলা: দাওয়াতী ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কৌশল হলো মানুষের সাথে নরম ও কোমল মন নিয়ে কথা বলা। এতে করে সহজেই মানুষের অন্তরে পরিবর্তন দেখা দিবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ ‘আপনি আল্লাহর দয়ায় তাদের প্রতি কোমল হৃদয়বান হয়েছিলেন। যদি আপনি তাদের প্রতি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন, তাহলে তারা আপনার আশপাশ হতে সরে পড়ত’ *(আলে ইমরান, ৩/১৫৯)*।

(৩) উত্তম পন্থায় প্রশ্নের জবাব দেওয়া: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ ‘আপনি উত্তম পন্থায় মন্দকে প্রতিহত করুন। তখন

* দক্ষিণ নাল্লাপোল্লা আদর্শ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা, সাভার, ঢাকা।

দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু’ *(হা-মীম আস-সাজদাহ, ৪১/৩৪)*।

(৪) কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী দাওয়াতী কার্যক্রম চালানো: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ‘আমি তো আমার প্রতি যা অহী অবতীর্ণ হয়, তারই অনুসরণ করি। বস্তুত আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই, তাহলে আমি ক্বিয়ামতের কঠিন দিনের শাস্তির ভয় করি’ *(ইউনুস, ১০/১৫)*। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ‘আমি তোমাদের মাঝে দু’টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তা ধরে রাখবে, তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু’টি বস্তু হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত’।[১]

(৫) সর্বদা দাওয়াতের কার্যক্রম চালু রাখা: দাওয়াত দেওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। দিনে-রাতে প্রতিটি মুহূর্তে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে হবে। সুখে-দুখে সব অবস্থায় দাওয়াতের ধারাবাহিকতা মানুষের মাঝে চালিয়ে যেতে হবে। যেমন নূহ আলাইহিস সালাম-এর দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾ ‘নূহ বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার জাতিকে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি, কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান করেছি আর ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে, চুপিসারেও দাওয়াত দিয়েছি’ *(নূহ, ৭১/৫-৯)*।

(৬) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ক্রমান্বয়ে পেশ করা: মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মু‘আয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে ইয়ামানে প্রেরণ করেন দাওয়াতের উদ্দেশ্যে, তখন তাকে তাদের মাঝে দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন, ﴿إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ﴾ ‘তুমি আহলে কিতাবের কাছে যাচ্ছ, সেখানে গিয়ে তাদেরকে প্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিবে যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা‘বূদ নেই আর মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বান্দা। তারা যখন এটা মেনে নিবে, তখন তুমি তাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের দাওয়াত দিবে আর তারা যখন এটা মেনে নিবে, তখন তুমি তাদেরকে যাকাত প্রদান করার দাওয়াত দিবে’।[২]

দাওয়াতদাতার চরিত্র ও গুণাবলি:

দাওয়াত ও তাবলীগী কাজের মুখ্য ভূমিকা যারা পালন করে যাচ্ছেন, তাদের মধ্যে যে সমস্ত ব্যক্তিগত গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা একান্ত প্রয়োজন, তা নিম্নরূপ—

(১) ইখলাছ ও বিশুদ্ধ নিয়্যত: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ ‘তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করে, তারই জন্য দ্বীনের প্রতি একাগ্রচিত্ত হয়ে’ *(আল-বায়্যিনাহ, ৯৮/৫)*। আর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَخْلِصْ دِينَكَ يَكْفِكَ الْقَلِيلُ مِنَ الْعَمَلِ ‘তুমি তোমার দ্বীনকে একনিষ্ঠভাবে পালন করো, তাহলে অল্প আমলই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে’।[৩]

(২) জ্ঞান অর্জন করা: দাওয়াত ও তাবলীগ করার পূর্বে কুরআন ও হাদীছের সম্যক জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুবাল্লিগের জন্য একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ‘আপনি জেনে রাখুন! আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা‘বূদ নেই’ *(মুহাম্মাদ, ৪৭/১৯)*।

(৩) ধৈর্যশীল হওয়া: দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে ধৈর্যধারণ করা প্রত্যেক দাঈর জন্য অতীব জরুরী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ ‘তাদের ছবরের কারণে তাদেরকে দু’বার পুরস্কৃত করা হবে এবং তারা ভালো দিয়ে মন্দের মোকাবিলা করে’ *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/৫৪)*।

(৪) ইলম অনুযায়ী আমল করা: দাওয়াতদাতা যে বিষয়ের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে, উক্ত বিষয়ের উপর নিজেকে যথাসম্ভব আমল করতে হবে। অন্যথা তার এ দাওয়াত কোনো উপকার বয়ে নিয়ে আসবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন এমন কথা বল, যা তোমরা নিজেরাই বাস্তবায়ন কর না? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ’ *(আছ-ছফ, ৬১/২-৩)*।

প্রবন্ধটির বাকী অংশ ২২ নং পৃষ্ঠায়

১. মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/১৫৯৪।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৩৭।

৩. মুসতাদরাকে হাকেম, হা/৭৮৪৪।

আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

*-জিশান মাহমূদ**

মানবের কল্যাণে আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআনে রয়েছে ১১৪টি সূরা এবং ৬২৩৬টি আয়াত। হাদীছে কিছু সূরা ও আয়াতের বিভিন্ন ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে সূরা আল-বাক্বারার ১৫৫ নং আয়াত রয়েছে, যেটি কুরআনের সবচেয়ে বেশি ফযীলতপূর্ণ আয়াত যাকে ‘আয়াতুল কুরসী’ বলা হয়। হাদীছে আয়াতুল কুরসীর অনেক ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হলো।

আবূ উমামা (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পরে ‘আয়াতুল কুরসী’ পাঠ করবে, সে ব্যক্তির জন্য তার মৃত্যু ছাড়া আর অন্য কিছু জান্নাতে প্রবেশের পথে বাধা নেই।[১] হাদীছে এসেছে,

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِى أَىُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ». قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِى أَىُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ». قَالَ قُلْتُ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ. قَالَ فَضَرَبَ فِى صَدْرِى وَقَالَ «وَاللَّهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ».

উবাই ইবনু কা‘ব (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেন, হে আবুল মুনযির! তোমার কাছে আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি আবার বলেন, হে আবুল মুনযির! তোমার কাছে আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ? আমি বললাম, *‘আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম’* (আয়াতুল কুরসী)। তখন তিনি আমার বুকে (হালকা) আঘাত করে বলেন, হে আবুল মুনযির! তোমার জ্ঞান আনন্দদায়ক হোক।[২]

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, প্রতিটি বস্তুরই চূড়া আছে। কুরআনের সর্বোচ্চ চূড়া হলো সূরা আল-বাক্বারা। এতে এমন একটি আয়াত আছে, যা কুরআনের আয়াতসমূহের প্রধান। তা হলো আয়াতুল কুরসী।[৩]

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে রামাযানের যাকাত (ফেত্বরার মাল-ধন) দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেন। বস্তুত (আমি পাহারা দিচ্ছিলাম ইত্যবসরে) একজন আগমনকারী এসে আঁজলা ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, ‘তোকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে পেশ করব’। সে আবেদন করল, ‘আমি একজন সত্যিকারের অভাবী। পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব আমার উপর, আমার দারুণ অভাব’। কাজেই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে (রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট হাযির হলাম।) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘হে আবূ হুরায়রা! গত রাতে তোমার বন্দী কী আচরণ করেছে?’ আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! সে তার অভাব-অনটন ও (অসহায়) সন্তানের-পরিবার অভিযোগ জানালো। সুতরাং তার প্রতি আমার দয়া হলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম’। তিনি বললেন, ‘সতর্ক থেকো, সে আবার আসবে’।

আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর অনুরূপ উক্তি শুনে সুনিশ্চিত হলাম যে, সে আবার আসবে। কাজেই আমি তার প্রতীক্ষায় থাকলাম। সে (পূর্ববৎ) এসে আঁজলা ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি তাকে বললাম, ‘অবশ্যই তোকে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে পেশ করব’। সে বলল, ‘আমি অভাবী, পরিবারের দায়িত্ব আমার উপর, (আমাকে ছেড়ে দাও) আমি আর আসব না’। সুতরাং আমার মনে দয়া হলো। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে উঠে (যখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে গেলাম তখন) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, ‘আবূ হুরায়রা! গত রাত্রে তোমার বন্দী কীরূপ আচরণ করেছে?’ আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! সে তার অভাব-অনটন ও অসহায় সন্তান-পরিবারের অভিযোগ জানালো। সুতরাং আমার মনে দয়া হলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম’। তিনি বললেন, ‘সতর্ক থেকো, সে আবার আসবে’।

সুতরাং তৃতীয়বার তার প্রতীক্ষায় রইলাম। সে (এসে) আঁজলা ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে বললাম, ‘এবারে তোকে নবী (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাযির করবই। এটা তিনবারের মধ্যে শেষবার। ‘ফিরে আসব না’ বলে তুই আবার ফিরে এসেছিস’। সে বলল, ‘তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে এমন কতকগুলো শব্দ শিখিয়ে

---

* ছনকান্দা, বটতলা, শ্রীবরদী, শেরপুর।

১.নাসাঈ কুবরা, হা/৯৯২৮; ত্বাবারানী, হা/৭৫৩২; ছহীহুল জামে‘, হা/৬৪৬৪; সিলসিলা ছহীহা, হা/৯৭২, হাদীছ ছহীহ।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/৮১০; আবূ দাঊদ, হা/১৪৬০।

৩. তিরমিযী, হা/২৮৭৮; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১৪৬১, হাসান লিগায়রিহী।

দেব, যার দ্বারা আল্লাহ তোমার উপকার করবেন'। আমি বললাম, 'সেগুলো কী?' সে বলল, 'যখন তুমি (ঘুমাবার জন্য) বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করে (ঘুমাবে)। তাহলে তোমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে। আর সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসতে পারবে না'।

সুতরাং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। আবার সকালে (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম) তিনি আমাকে বললেন, 'তোমার বন্দী কী আচরণ করেছে?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! সে বলল, "আমি তোমাকে এমন কতিপয় শব্দ শিখিয়ে দেব, যার দ্বারা আল্লাহ আমার কল্যাণ করবেন।" বিধায় আমি তাকে ছেড়ে দিলাম'। তিনি বললেন, 'সে শব্দগুলো কী?' আমি বললাম, 'সে আমাকে বলল, 'যখন তুমি বিছানায় (ঘুমানোর জন্য) যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত *'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম'* পড়ে নেবে'। সে আমাকে আরো বলল, 'তার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বদা তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে। আর সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসবে না'। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, 'শোনো! সে নিজে ভীষণ মিথ্যাবাদী; কিন্তু তোমাকে সত্য কথা বলেছে। হে আবূ হুরায়রা! তুমি জানো, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথা বলছিলে?' আমি বললাম, 'না'। তিনি বললেন, 'সে শয়তান ছিল'।[৪]

পরিশেষে, আমরা যেন বিশেষ ফযীলতপূর্ণ আয়াতুল কুরসীর গুরুত্ব ও ফযীলত জেনে তা আমল ও পাঠ করে অশেষ উপকার পেতে পারি, আল্লাহ সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৪. ছহীহ বুখারী, হা/২৩১১।

"দাওয়াত ও তাবলীগ"-এর বাকী অংশ

(৫) আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা: প্রতিটি ভালো কাজের পূর্বে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা। এটা প্রতিটি মুমিন বান্দার জন্য একান্ত জরুরী। আর কাউকে দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে প্রথমে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ 'হে রাসূল! আপনি বলুন! আমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট, ভরসাকারীরা তাঁর উপরই ভরসা করে' *(আয-যুমার, ৩৯/৩৮)*।

আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য:

দাওয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ 'হে রাসূল! আপনি তাবলীগ (প্রচার) করুন, যা আপনার রবের পক্ষ হতে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে' *(আল-মায়েদা, ৫/৬৭)*।

আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার হুকুম বা বিধান:

দাওয়াতের তিনটি স্তর রয়েছে। সেগুলো হলো—

(১) ফরযে আইন: যা প্রত্যেক মুমিন-মুসলিমদের উপর ফরয। যা ছেড়ে দিলে কঠিন গুনাহগার হবে। আর তা হলো যখন সমাজের লোকেরা গুনাহের কাজে লিপ্ত হবে, নেকীর কাজ ছেড়ে দিবে।

(২) ফরযে কেফায়া: কিছু সংখ্যক লোক দাওয়াতের কাজ করলে বাকীদের জন্য যথেষ্ট হবে। যখন মানুষেরা নেকীর কাজ বেশি করে আর গুনাহের কাজ ছেড়ে দেয়।

(৩) দাওয়াতে মুবাহ: দাওয়াত দিলে ছওয়াব পাবে আর না দিলে গুনাহগার হবে না। যখন সমাজের লোকেরা নেকীর কাজ করতে থাকবে, তখন সমাজের ভিতর থেকে কিছু লোক এ দাওয়াতের কাজে সবসময় নিয়োজিত থাকবে। এই অবস্থায় দাওয়াত দেওয়া মুবাহ হয়ে যায়।

আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার ফযীলত:

আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া ও তাবলীগ করার ফযীলত ও প্রতিদান অফুরন্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ 'তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎ আমল করে এবং বলে আমি একজন মুসলিম' *(হা-মীম আস-সাজদা, ৪১/৩৩)*।

উপসংহার:

আসুন! আমরা সবাই কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করি আর জান্নাত লাভ করি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

তাক্বদীরে বিশ্বাস

-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ*

তাক্বদীর অর্থ নির্ধারণ করা।[১] এটি ঈমান বিল ক্বদার (اَلْإِيْمَانُ بِالْقَدَرِ)। তার মানে, প্রতিটি সৃষ্টির জন্য আল্লাহর ব্যবস্থাপনা যে নির্ধারিত, তা বিশ্বাস করা। ভালো-মন্দ যা কিছু সবই আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ 'আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে' *(আল-ক্বামার, ৫৪/৪৯)*।

কোনো সৃষ্টির জ্ঞানের সাথে আল্লাহর জ্ঞানের তুলনা হয় না। সৃষ্টির আগেই তিনি বিশ্বের সবকিছু কোথায় কীভাবে সংঘটিত হবে সবই জানেন। এ বিশ্বাস হলো, সবকিছু 'লাওহে মাহফূযে' (সংরক্ষিত পত্রে) লিখে রেখেছেন। লিখনের প্রকৃতি আমরা জানি না। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ 'অদৃশ্যের চাবি তাঁরই নিকট রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে-স্থলে যা কিছু আছে, তা তিনিই অবগত। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটা পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্যকণাও নেই অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই' *(আল-আনআম, ৬/৫৯)*।

তাক্বদীরে যারা বিশ্বাস করে, তারা নিরাশ হয় না। অপেক্ষার প্রহর গুনে মহাসাফল্যের। যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিয়েছেন। যেমন— যাকারিয়া আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ 'হে আমার রব! আমি তো কখনো আপনাকে ডেকে ব্যর্থ হইনি' *(মারইয়াম, ১৯/৪)*।

জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট আসতে পারে, যা জীবনকে এলোমেলো করে দিবে। দুর্দিনে কেউ পাশে থাকবে না। রিযিক্বের কষ্টে ভুগবে। নিজেকে খুব অসহায় মনে হবে। তবু আশাহত হওয়া যাবে না। এমন সময় রব বলেন, ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ 'জমিনে বিচরণশীল সকল প্রাণীর রিযিক্বের দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত। সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে' *(হূদ, ১১/৬)*।

বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া, ভালোবাসা, করুণার কোনো কমতি নেই। পৃথিবীর জীবন সংকীর্ণ হয়ে গেছে, রিযিক্ব কমে গেছে এমনটা ভাবার সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ - يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ 'প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ। তিনি যা ইচ্ছা মুছে ফেলেন আর যা ইচ্ছা রেখে দেন। আর তাঁর কাছেই আছে উম্মুল কিতাব' *(আর-রা'দ, ১৩/৩৮-৩৯)*।

মানুষকে আল্লাহ বিবেক, বিচারশক্তি ও জ্ঞান দান করেছেন। কাজেই সে তার বিচারবুদ্ধি দিয়ে কর্ম করবে। আর কর্মের ফল ভোগ করবে। এটাই তাক্বদীরে বিশ্বাস। আল্লাহর বাণী এভাবে, ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ - وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ - وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ 'আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি দুটি চক্ষু? আর জিহবা ও দুটি ঠোঁট? আর আমি তাকে কি দুটি পথ দেখাইনি?' *(আল-বালাদ, ৯০/৮-১০)*।

মক্কার কাফেররা তাক্বদীরের ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে ছিল। তারা যা বলছে তা অহীর জ্ঞান নয়, বরং তা যুক্তিতর্কভিত্তিক ধারণা মাত্র।

অহীর জ্ঞান তো হলো কুরআনুল কারীমের জ্ঞান। অনেকে মনে করেন ভাগ্য অনুসারেই যেহেতু সবকিছু হয়, তাহলে কর্মের কী দরকার? এটি একটি বিকৃত ধারণা, ভ্রান্ত আক্বীদা। যে অবিশ্বাসী তাক্বদীর নিয়ে বিবাদ করবে, সে মূলত নিজেকে আল্লাহর কর্মের পরিদর্শক ও বিচারক নিয়োগ করবে। সে বলতে চায়, কর্ম করা আমার দায়িত্ব নয়। আমার কাজ হলো আল্লাহর কাজের বিচার করা।

আল্লাহর কাজের বিচার করা মানুষের কর্ম হতে পারে না। তিনি কী জানেন, কী লিখেছেন, কী মুছেন, কী রেখে দেন, তার কিছুই মানুষকে জানাননি। এর নামই তাক্বদীর। একেই বলে তাক্বদীরে বিশ্বাস। তিনি বান্দাহকে তার কর্মের চেয়ে বেশি পুরস্কার দিতে চান। তাই মুমিন নিশ্চিন্তে কর্ম করে। ফলাফলের দায়িত্ব তাঁর উপরেই ছেড়ে দেয়।

তাক্বদীরে বিশ্বাসের ফল ভোগ করেছেন ছাহাবায়ে কেরাম। তাক্বদীরের প্রতি তাদের ছিল দৃঢ় প্রত্যয়। অটল অবিচল আস্থা। তাক্বদীরে বিশ্বাসী কর্মবীরকে আল্লাহ ভালোবাসেন। পরাজয়ের হতাশা, হা-হুতাশ ও গ্লানি থেকে রক্ষা করেন। ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা দ্বিধাদ্বন্দ্ব মুক্ত জীবন দান করেন। পরাজয়কে পদতলে মাড়িয়ে মুমিন বিশ্বাসের বলে বলিয়ান হয়। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মুমিন থেকে বেশি প্রিয় ও বেশি ভালো। তবে তাদের উভয়ের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তোমরা যাতে কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে, সে বিষয়ে আগ্রহী ও সচেষ্ট হও এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো। অক্ষম, দুর্বল বা হতাশ হয়ে যেয়ো না'।[২]

* মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।

১. ইবনু ফারিস, মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ, ৫/৬২।

২. ছহীহ মুসলিম, ৪/২০৫২।

সত্য রক্ষা করে, মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে

[২০ রবীউল আউয়াল, ১৪৪৭ হি. মোতাবেক ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পবিত্র হারামে মাক্কীর (কা'বা) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন ***শায়খ মাহের বিন হামাদ আল-মুআইক্বলী*** *হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক* ***আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ।*** *খুৎবাটি* ***'মাসিক আল-ইতিছাম'****-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সুউচ্চ ও সুমহান এবং যিনি তাঁর বান্দাদের কথা ও কাজে সত্যবাদী হওয়ার দিকে আহ্বান করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাঁর মহিমা সুমহান, তাঁর নামসমূহ পবিত্র, তাঁর মর্যাদা অতুলনীয় এবং তাঁর গুণাবলি সুউচ্চ।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী ও নেতা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি সর্বোত্তম গুণাবলির অধিকারী এবং প্রজ্ঞা ও অল্প কথায় ব্যাপক অর্থ প্রকাশের বরকতময় গুণে ভূষিত। মহান আল্লাহ তাঁর উপর দরূদ, সালাম ও বরকত বর্ষণ করুন এবং তাঁর পরিবারবর্গ, ছাহাবী ও ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

অতঃপর, হে ঈমানদারগণ! আমি নিজেকে ও আপনাদেরকে আল্লাহভীতির অছিয়ত করছি। যে আল্লাহকে ভয় করে, তার মনোযোগ আখেরাতের দিকে নিবদ্ধ হয় এবং যার লক্ষ্য হয় আখেরাত, আল্লাহ তার অন্তরে পরিতৃপ্তি দান করেন, তার এলোমেলো অবস্থাকে গুছিয়ে দেন আর দুনিয়া তার কাছে অনীহার জায়গা হিসাবে ধরা দেয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন। আর তাকে রিযিক্ব দিবেন (এমন উৎস) থেকে যা সে ধারণাও করতে পারে না' *(আত-তালাক, ৬৫/২-৩)*।

হে মুসলিম উম্মাহ! ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তার 'আছ-ছহীহ' গ্রন্থে কা'ব ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কা'ব ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি যখন জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসছেন, তখন আমি চিন্তিত হয়ে গেলাম এবং মিথ্যা অজুহাত খুঁজতে থাকলাম। মনে মনে স্থির করলাম, আগামীকাল এমন কথা বলব যাতে করে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ক্রোধকে ঠান্ডা করতে পারি। আর এ সম্পর্কে আমার পরিবারের জ্ঞানীগুণীদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে থাকলাম। এরপর যখন প্রচারিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে পৌঁছে যাচ্ছেন, তখন আমার অন্তর থেকে মিথ্যা দূর হয়ে গেল আর মনে দৃঢ় প্রত্যয় হলো যে, এমন কোনো উপায়ে আমি তাঁকে কখনো ক্রোধমুক্ত করতে সক্ষম হব না, যাতে মিথ্যার লেশ থাকে। অতএব, আমি মনে মনে স্থির করলাম যে, আমি সত্য কথা-ই বলব। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকালবেলায় মদীনায় প্রবেশ করলেন। তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত ছালাত আদায় করতেন, তারপর লোকদের সামনে বসতেন। কা'ব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বর্ণনা করেন, আমি নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সামনে হাযির হলাম। আমি যখন তাঁকে সালাম দিলাম, তখন তিনি রাগান্বিত চেহারায় মুচকি হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, 'এসো'। আমি সে মতে এগিয়ে গিয়ে একেবারে তাঁর সম্মুখে বসে গেলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কারণে তুমি অংশগ্রহণ করলে না? তুমি কি যানবাহন ক্রয় করনি?' তখন আমি বললাম, হ্যাঁ, করেছি। আল্লাহর কসম! এ কথা সুনিশ্চিত যে, আমি যদি আপনি ব্যতীত দুনিয়াদার অন্য কোনো ব্যক্তির সামনে বসতাম, তাহলে আমি তার অসন্তুষ্টিকে ওযর-আপত্তি পেশের মাধ্যমে ঠান্ডা করার চেষ্টা করতাম আর আমি তর্কে পটু। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি পরিজ্ঞাত যে, আজ যদি আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলে আমার প্রতি আপনাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি, তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দিতে পারেন। আর যদি আপনার কাছে সত্য প্রকাশ করি, যাতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তবুও আমি এতে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার অবশ্যই আশা করি। না, আল্লাহর কসম! আমার কোনো ওযর ছিল না। আল্লাহর কসম! সেই যুদ্ধে আপনার সঙ্গে না যাওয়ার সময় আমি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সে সত্য কথা-ই বলেছে। তুমি এখন চলে যাও, যতদিন না তোমার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ফয়সালা করে দেন'। এরপর যখন আল্লাহ কা'ব ইবনু মালেক ও তার দুই সঙ্গীর ব্যাপারে ফয়সালা করে দিলেন এবং তাদের ব্যাপার শেষ করলেন তওবার মাধ্যমে। তখন কা'ব নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলেন আর তিনি মসজিদে ছিলেন। কা'ব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বর্ণনা করেন, এরপর আমি যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে সালাম জানালাম, তখন তাঁর চেহারা আনন্দের আতিশয্যে ঝকঝক করছিল। তিনি

আমাকে বললেন, ‘তোমার মাতা তোমাকে জন্মদানের দিন হতে যতদিন তোমার উপর অতিবাহিত হয়েছে তার মধ্যে উৎকৃষ্ট ও উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ করো’। কা‘ব বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এটা কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, ‘আমার পক্ষ থেকে নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে’। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন খুশি হতেন, তখন তাঁর চেহারা এত উজ্জ্বল ও ঝলমলে হতো যেন পূর্ণিমার চাঁদের ফালি, এতে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি বুঝতে পারতাম। আমি যখন তাঁর সম্মুখে বসলাম, তখন আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ তাআলা সত্য বলার কারণে আমাকে রক্ষা করেছেন, তাই আমার তওবা কবুলের নিদর্শন ঠিক রাখতে আমার বাকি জীবনে সত্য-ই বলব। আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি এ সত্য বলার কথা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জানিয়েছি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমার জানা মতে কোনো মুসলিমকে সত্য কথার বিনিময়ে এরূপ নেয়ামত আল্লাহ দান করেননি, যে নেয়ামত আমাকে দান করেছেন। (কা‘ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন) যেদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে সত্য কথা বলেছি সেদিন হতে আজ পর্যন্ত অন্তরে মিথ্যা বলার ইচ্ছাও করিনি। আমি আশা পোষণ করি যে, বাকি জীবনও আল্লাহ তাআলা আমাকে মিথ্যা থেকে রক্ষা করবেন। এরপর আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপর এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, ‘অবশ্যই আল্লাহ নবী, মুহাজির ও আনছারদের তওবা কবুল করলেন’ *(আত-তাওবা, ৯/১১৭)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ‘হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো’ *(আত-তাওবা, ৯/১১৯)*। (কা‘ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন) আল্লাহর শপথ! ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনো আমার উপর এত উৎকৃষ্ট নেয়ামত আল্লাহ প্রদান করেননি যা আমার কাছে শ্রেষ্ঠতর, তা হলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আমার সত্য বলা এবং তাঁর সঙ্গে মিথ্যা না বলা; যদি মিথ্যা বলতাম, তবে মিথ্যাচারীদের মতো আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম।[১]

অতঃপর আল্লাহ তাআলা কা‘ব ইবনু মালেক ও সকল ছাহাবী রাযিয়াল্লা-হু আনহুম-এর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর আমরা তাদের সাথে একত্রিত হব। মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয় মুত্তাক্বীরা থাকবে বাগ-বাগিচা ও ঝরনাধারার মধ্যে, যথাযোগ্য আসনে, সর্বশক্তিমান মহান অধিপতির নিকটে’ *(আল-ক্বামার, ৫৪/৫৪-৫৫)*।

হে মুমিনগণ! সত্যবাদিতা সকল অবস্থায় একজন মুমিনের পরিচায়ক এবং এটা তার কথাবার্তায়, কাজে ও আচরণে পোশাকের মতো। সত্যবাদিতা তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, তার স্বভাবের গভীরে প্রোথিত, এমনকি সত্যবাদিতা তার সহজাত চরিত্রে পরিণত হয় যা কখনোই তার থেকে পৃথক হয় না। তাই সে নিজেকে বিচার-বিবেচনা ও প্রমাণহীন কোনো কথা বলার সুযোগ দেয় না এবং মিথ্যা ধারণার ওপর ভিত্তি করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তও দেয় না। বরং সে সত্যকে অনুসন্ধান করে, সেটাকে কামনা করে এবং তার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, অবশেষে আল্লাহর কাছে তাকে ‘ছিদ্দীক্ব’ তথা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর এ মর্যাদা হলো নবুঅত ও শহীদী মর্যাদার মধ্যবর্তী এক মহান ও সুউচ্চ মর্যাদা। মহান আল্লাহ বলেন, ‘যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা নবী, ছিদ্দীক্ব, শহীদ ও নেককার লোকদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, তারা কতই না উত্তম সঙ্গী!’ *(আন-নিসা, ৪/৬৯)*। ছহীহ মুসলিমের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘সত্যকে ধারণ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা সততা নেক কর্মের দিকে পথপ্রদর্শন করে আর নেক কর্ম জান্নাতের দিকে পথপ্রদর্শন করে। কোনো ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বললে এবং সত্য বলার চেষ্টায় রত থাকলে, অবশেষে আল্লাহর নিকটে সে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়’।[২]

অতএব, সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর প্রতি সত্যবাদী হলো, ফলে আল্লাহও তাকে সত্যায়িত করলেন। সুসংবাদ তার জন্য, যে আল্লাহর বান্দাদের প্রতি সত্যবাদী হলো, ফলে আল্লাহও তাকে সম্মানিত করলেন। আরও সুসংবাদ তার জন্য, যে সত্যবাদীদের পথে দৃঢ় রইল, অবশেষে আল্লাহও তাকে (এই অবস্থায়) মৃত্যু দিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘মুমিনদের মধ্যে কতক লোক আল্লাহর সঙ্গে কৃত তাদের অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কতক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে (শাহাদাত বরণ) করেছে আর তাদের কতক অপেক্ষায় আছে। তারা (তাদের সংকল্প) কখনো তিল পরিমাণ পরিবর্তন করেনি’ *(আল-আহযাব, ৩৩/২৩)*।

أقولُ ما تسمعون، وأستغفرُ اللهَ لي ولكم من كل ذنبٍ وخطيئةٍ، فاستغفِروه؛ إنه كان غفّارًا.

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য। তিনি সত্য-ই বলেন আর তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্যিকারের উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনিই একমাত্র মহান রাজাধিরাজ ও সত্যিকারের উপাস্য। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী ও নেতা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও

১. ছহীহ বুখারী, হা/৪৪১৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৬৯।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬০৭।

রাসূল, যিনি ছিলেন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। আল্লাহ তাঁর উপর দরূদ ও বরকত বর্ষণ করুন আর তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ, ছাহাবী এবং যারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করবে তাদের উপরও শান্তি ও বরকত অবতীর্ণ হোক।

অতঃপর, হে মুমিনগণ! সত্যবাদিতা একটি মহান চরিত্র। মহান আল্লাহ স্বীয় কিতাবে সুস্পষ্ট আয়াতের মাধ্যমে নিজেকে সত্যবাদিতার গুণে প্রশংসিত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তিনি ক্বিয়ামত দিবসে সকলকে একত্রিত করবেন-ই, এতে কোনো সন্দেহ নেই, আল্লাহ অপেক্ষা আর কার কথা অধিক সত্য হতে পারে?' *(আন-নিসা, ৪/৮৭)*। তিনি আরও বলেন, 'আর কথায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে?' *(আন-নিসা, ৪/১২২)*। রাসূলগণকে যেসব গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে তার মধ্যে সত্যবাদিতা-ই সবচেয়ে মর্যাদাকর গুণ। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর স্মরণ করো এই কিতাবে ইবরাহীমকে। নিশ্চয় সে ছিল পরম সত্যবাদী নবী' *(মারইয়াম, ১৯/৪১)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'আর স্মরণ করো এই কিতাবে ইসমাঈলকে। সে ছিল সত্যিকারের ওয়াদা পালনকারী এবং সে ছিল রাসূল ও নবী *(মারইয়াম, ১৯/৫৪)*।

অতঃপর, আমাদের নবী ও নেতা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুঅত পূর্ববর্তী জীবনেও সৎ ও আমানতদার ছিলেন। এরপর তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন, সত্য সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন এবং সত্যের উপর চলার আদেশ দিয়েছেন। তিনি ছিলেন সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠ প্রতিশ্রুতিদাতা এবং অঙ্গীকারকারী। তাঁর রব তাঁকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে সত্য দ্বারা শোভিত করেছেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন ভিতরে ও বাইরে সত্যের দাওয়াত পৌঁছে দিতে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর বলো, হে আমার রব! আমাকে প্রবেশ করাও উত্তমভাবে এবং বের করো উত্তমভাবে। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান করো' *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৮০)*।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীআত হলো সত্যের শরীআত এবং তাঁর ছাহাবীগণ হলেন ছিদ্দীক্ব। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং যে তা সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই হলো মুত্তাক্বী' *(আয-যুমার, ৩৯/৩৩)*।

হে ঈমানদারগণ! মিথ্যার বিষয়টি যত বড় হয়, তার বিপদও তত ভয়াবহ হয় এবং তার শাস্তিও গুরুতর হয়। বিশেষত আজকের ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমের উপস্থিতি এবং কোনো বিষয় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার যুগে যেভাবে গুজব তৈরি আর প্রচার করা হয় তা সমাজ ও তার নিরাপত্তার ওপর অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অতএব, বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে সতর্ক থাকতে হবে যে, সে যেন শত্রুদের হাতের হাতিয়ার হয়ে না পড়ে এবং সে নিজের, তার সমাজের ও দেশের ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। আর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাচাই-বাছাই করা ছাড়া খবর প্রচার করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়'।[3] তাহলে (একবার ভাবুন তো) সেই ব্যক্তির অবস্থা কী হতে পারে, যে নিজেই গুজব ও মিথ্যা ছড়ায়? সে তো কঠোর শাস্তির ঝুঁকিতে পড়ে যায়। যেমনটি ছহীহ বুখারীতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বপ্নের বিবরণীতে এসেছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'অতঃপর ঐ ব্যক্তি যার কাছে গিয়ে দেখলাম যে, তার মুখের এক ভাগ মাথার পিছন দিক পর্যন্ত, এমনিভাবে নাসারন্ধ্র ও চোখ মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল সে হলো ঐ ব্যক্তি, যে সকালে নিজ ঘর থেকে বের হয়ে এমন কোনো মিথ্যা বলে, যা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে'।[৪]

আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর মিথ্যারোপ করা সবচেয়ে ভয়াবহ। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে ক্বিয়ামতের দিন তুমি তাদের চেহারাগুলো কালো দেখতে পাবে। অহংকারীদের বাসস্থান জাহান্নামের মধ্যে নয় কি?' *(আয-যুমার, ৩৯/৬০)*।

ছহীহ বুখারীর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার আসন বানিয়ে নেয়'।[৫]

অতএব, সাবধান! হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা সত্যবাদিতাকে নিজেদের প্রতীক ও বাহ্যিক আচরণের অলংকার হিসেবে গ্রহণ করুন। গোপনে ও প্রকাশ্যে সকল অবস্থায় সত্যকে আঁকড়ে ধরুন। আল্লাহ যেন আপনাদের অন্তরে তাক্বওয়া দান করেন এবং আপনাদের জীবন চলার পথে সঠিকতা ও দৃঢ়তা দান করেন। আর স্মরণ রাখুন! সত্যবাদিতা হলো ইখলাছের অংশ আর ক্বিয়ামতের দিনে কেবল সত্যবাদীরাই মুক্তি লাভ করবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ বলবেন, এটা হলো সেই দিন, যেদিন সত্যবাদীগণকে তাদের সততা উপকার করবে। তাদের জন্য আছে জান্নাতসমূহ, যার নিচে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এটাই মহাসাফল্য' *(আল-মায়েদা, ৫/১১৯)*।

---

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৫১।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/৭০৪৭।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/১১০।

মানুষকে ক্ষমা করা শিখতে হবে!

*-হাসান আল-বান্না মাদানী**

নিশ্চয় অন্যায়, সমালোচনা, মিথ্যা অপবাদ, উপহাস, কটুকথা ইত্যাদিতে হৃদয় ব্যথিত হয়। কারও মনে কষ্ট দেওয়া একজন মুসলিমের কাজ নয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনো কাউকে কষ্ট দেননি। অনেক সময় বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও এ বিষয়টি ভুলে যান। কিন্তু যাকে কষ্ট দেওয়া হলো, তার সেই সময় করণীয় কী? আঘাত পেয়ে উগ্র হয়ে সে কি প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে, না-কি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির আশায় সেই মুসলিম ভাইকে ক্ষমা করবে? আল্লাহ তাআলা বান্দার সাথে তেমনই ব্যবহার করেন, যেমন বান্দা আল্লাহ তাআলার অপর বান্দাদের সাথে করে থাকে। তাই বান্দা যখন অন্যের উপর দয়া করে, তখন আল্লাহ তাআলাও তার উপর দয়া করেন। অনুরূপভাবে যখন বান্দা অন্যকে ক্ষমা করে দেয়, তখন আল্লাহ তাআলাও সেই বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ 'তারা যেন ক্ষমা করে দেয়, তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ক্ষমা করেন' *(আন-নূর, ২৪/২২)*।

এ আয়াতের প্রেক্ষাপট হলো এই যে, যখন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-কে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তখন কিছু ছাহাবায়ে কেরামও এই দোষারোপে লিপ্ত হয়েছিলেন, যাদের মধ্যে একজন ছিলেন মিসত্বাহ ইবনু উছাছা। মিসত্বাহ ইবনু উছাছা হলেন আবূ বকর ছিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর মাসতুতো ভাই। তিনি আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে মদীনা এসেছিলেন, তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন আবূ বকর ছিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু।

মিসত্বাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে আবূ বকর ছিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বললেন, আমি আর কখনো তোমার কোনো খরচ বহন করব না। অতঃপর উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। আয়াতটি শোনামাত্রই তিনি মিসত্বাহকে ক্ষমা করে দিলেন এবং বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি চাই যে, আল্লাহ আমার গুনাহ ক্ষমা করুন।[১]

বিভিন্ন সময়ে নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে যারা কষ্ট দিত, যারা তাঁর সাথে অশিষ্ট আচরণ করত, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।

عن جابر بن عبد الله ﵁ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي فَقُلْتُ اللَّهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ.

জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা বলেন, এক যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় প্রায় দুপুর বেলায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আমরা কোনো এক জায়গায় গাছের নিচে অবস্থান করছিলাম। নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও এক গাছের নিচে অবস্থান করছিলেন। তাঁর তরবারি সেই গাছে ঝুলছিল। আমাদের চোখে একটু ঘুম নেমে এসেছিল। সহসা আমরা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর আওয়াজ শুনে তাঁর কাছে পৌঁছলাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এই লোকটি আমার তরবারি কোষমুক্ত করে আমাকে বলে, আপনাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা আমাকে রক্ষা করবেন। এ প্রশ্ন সে তিনবার করে এবং আমি তাকে একই উত্তর দিই'। নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেই বেদুঈনকে কোনো শাস্তি দিলেন না।[২]

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! উহুদের দিনের চেয়ে বড় কষ্ট আপনার জীবনে কি কখনো এসেছে? নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি সব থেকে বেশি যন্ত্রণা সহ্য করেছি, যে দিন (তায়েফে) আমি আবদে ইয়ালীল ও তার ভাইদের কাছে দাওয়াতের বিষয়ে সহযোগিতা চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা আমার কথায় সাড়া দেয়নি।

চিন্তিত হয়ে মক্কার পানে হেঁটে যাচ্ছিলাম। (মক্কা ও তায়েফের মাঝে) ক্বারনুছ ছাআলিবে পৌঁছে আমার জ্ঞান স্বাভাবিক হয়। আকাশে লক্ষ করলাম এক টুকরো মেঘ আমাকে ছায়া করেছে এবং সেই মেঘের মধ্যে জিবরীল আলাইহিস সালাম-কে দেখলাম, তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, আপনার জাতি যা উত্তর দিয়েছে, আল্লাহ তাআলা তা শুনেছেন। তিনি আপনার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। আপনি তাকে যা আদেশ করবেন, তিনি তা

---

* কালিয়াচক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত; মুহাদ্দিছ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৪৭৫০।

২. ছহীহ বুখারী, হা/২৯১০।

অবশ্যই পালন করবেন'। পাহাড়ের ফেরেশতা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে সালাম করে বললেন, যদি আপনি চান, আমি মক্কার এই দুই পাহাড় এদের উপর চাপিয়ে দিব। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, '(না) বরং আমি আল্লাহ তাআলার কাছে আশা করি যে, তিনি এদের মধ্যে কিছু এমন মানুষ তৈরি করবেন, যারা একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে এবং আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে অংশীদার করবে না'।[৩]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِى مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِى عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম, তাঁর গায়ে ছিল মোটা পাড়বিশিষ্ট একটি নাজরানী চাদর। হঠাৎ এক বেদুঈন এসে তাঁর চাদর ধরে এত জোরে টান দিল যে, তাঁর ঘাড়ে চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেল। সে বেদুঈন বলতে লাগল, মুহাম্মাদ! আল্লাহ-প্রদত্ত প্রচুর সম্পদ আপনার কাছে আছে, কিছু আমাকে দেওয়ার নির্দেশ দিন। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, তারপর তাকে কিছু দেওয়ার জন্য বললেন।[৪] রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে একটুও তিরস্কার করলেন না।

উসামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একদা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনু উবাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। কারণ তিনি অসুস্থ ছিলেন। রাস্তায় কিছু মুসলিম, মুশরিক ও ইয়াহূদীদের একটি বৈঠক দেখে থেমে গেলেন, বৈঠকে মুনাফেক্বদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইও উপস্থিত ছিল (এ ঘটনা তার বাহ্যিক ইসলাম প্রকাশের পূর্বের)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কুরআন শোনালেন এবং আল্লাহর দিকে আহ্বান করলেন। ইবনু উবাই বলতে লাগল, হে ব্যক্তি! আপনি যা বলছেন তা যদি সত্য হতো, তাহলে এর চেয়ে ভালো কোনো কথা-ই হতো না। তাই আমাদের বৈঠকে এসে এসব বলে আমাদেরকে কষ্ট দিবেন না, ফিরে যান, যারা আপনার কাছে আসবে তাদেরকে এই গল্প শোনাবেন। সেই মজলিসে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রাযিয়াল্লা-হু আনহু ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! না, আপনি অবশ্যই এই বার্তা আমাদেরকে শোনান, আমাদের খুব ভালো লাগে। অতঃপর মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে গালমন্দ শুরু হয়ে যায়, এমনকি তারা পরস্পরকে আঘাত করার উপক্রম হয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পরিবেশটা শান্ত করলেন, তারপর সা'দ ইবনু উবাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর কাছে পৌঁছে তাকে এই ঘটনা শোনালেন। সা'দ রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি আব্দুল্লাহকে ক্ষমা করে দিন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিলেন। উসামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীবর্গ মুশরিক ও আহলে কিতাবদেরকে ক্ষমা করে দিতেন, যেমন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আদেশ করেছেন এবং তাদের কষ্টে ধৈর্যধারণ করতেন।[৫]

যদি আমাদের হৃদয়ে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর প্রকৃত ভালোবাসা থাকে, তাহলে আমরাও পরস্পরকে ক্ষমা করার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ 'যদি তোমরা শাস্তি দাও, তাহলে ঠিক ততটুকুই শাস্তি দিবে, যতটুকু অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। কিন্তু যদি ধৈর্যধারণ কর, তাহলে ধৈর্যশীলদের জন্য সেটাই উত্তম' *(আন-নাহল, ১৬/১২৬)*।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর এই আদর্শে আদর্শিত হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৩২৩১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭৯৫; ফাতহুল বারী, ৬/৩১৫-৩১৬।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/৫৮০৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৫৭।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৪৫৬৬।

সফলতার সূত্র

-সাব্বির আহমাদ*

আপনার হৃদয়জুড়ে রাজ্যের হাপিত্যেশ, চোখে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু আর বুকভরা দীর্ঘশ্বাস। দিনের পর দিন এত কষ্ট করার পরও আপনি সফলতার ছোঁয়া পাচ্ছেন না, এত সংগ্রাম করার পরও ব্যর্থতাই আপনার নিত্যসঙ্গী।

কিন্তু কেন? কেন এমন হয়? এত কিছুর পরও কেন সফলতা আমাকে ধরা দেয় না? এই প্রশ্নটা আমাদের অনেকের।

প্রতিদিন রাত জেগে জেগে পড়ালেখা করার পরও হয়তো আপনার নামটা মেরিট লিস্টে আসেনি অথবা দিনের পর দিন পরিশ্রম করার পরও হয়তো আপনার ব্যবসায় কোনো উন্নতি হচ্ছে না। এজন্য আপনার ভেতর ভীষণ মন খারাপের ভার, হতাশার বৈদ্যুতিক প্রবাহ আপনাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে প্রতিনিয়তই।

ঠিক এই সময়ে এসে আপনাকে একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, বিফলতার ওপর ভর করেই কিন্তু সফলতার ভিত্তি অর্জিত হয়।

আপনি সফল হতে চান, কিন্তু পারেন না। অনেক চেষ্টা করেন, তবুও পারেন না। তাই আপনার জন্য আমি সফলতার কিছু সূত্র তৈরি করেছি, যার মাধ্যমে খুব সহজেই আপনি সফলতার সন্ধান পাবেন বলে আমার বিশ্বাস। তাহলে চলুন! এবার তবে জেনে নেওয়া যাক সফলতার সূত্রাবলি—

(১) প্রবল ইচ্ছাশক্তি: ইচ্ছাশক্তি মানুষকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। ইচ্ছার পাখায় ভর করে মানুষ পৌঁছে যেতে পারে সাফল্যের তোরণ শিখরে। কিন্তু এই ইচ্ছা নিছক কোনো ইচ্ছা নয়, এই ইচ্ছা আপনার আবেগতাড়িত কোনো ইচ্ছা নয়; এই ইচ্ছা হলো প্রবল ইচ্ছা, যে ইচ্ছা ঝড়ো হাওয়া কিংবা কালবৈশাখীর মাঝেও অটল, অনড়, দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। যে ইচ্ছা একটা ভয়াবহ সামাজিক অভিযান শেষ করে একদম অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসতে পারে তার আপন নীড়ে। হ্যাঁ, এ ইচ্ছার কথাই আমি বলছি।

প্রিয় নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ‘প্রতিটি কাজই নিয়্যত অনুসারে হয়ে থাকে’।[১]

ইচ্ছার ওপর ভর করেই আমাদের সমস্ত কাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাই ইচ্ছা নড়বড়ে হলে আমাদের সমস্ত কর্ম ও পরিকল্পনা যে কোনো সময় ধসে পড়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং ইচ্ছাশক্তিই হলো আমাদের সকল কাজের পূর্বশর্ত।

অতএব, আজই দাঁতে দাঁত চেপে খুবই শক্তভাবে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ইচ্ছার রঙতুলি দিয়ে আপনার হৃদয়ের খাতায় এঁকে ফেলুন আগামী দিনের পরিকল্পনা। আগামী এক সপ্তাহে এবং এক মাসে আপনার কী কী করার ইচ্ছা আছে, তা ঠিক করে ফেলুন। এক বছর পর আপনি নিজেকে কোন অবস্থানে দেখতে চান, সেটাও গেঁথে নিন ইচ্ছার মালায়।

এই ইচ্ছাগুলো বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতা এসে আপনার পথ রোধ করতে চাইবে, কিন্তু আপনার সেই সুপ্ত ইচ্ছাটুকু রক্ষার্থে এই প্রতিবন্ধকতাগুলোর বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে লড়ে যেতে পারাটাই মূলত জীবনের সার্থকতা।

অতএব, ঝটপট আপনার ইচ্ছার ট্রেনে উঠে পড়ুন আর ছুটতে থাকুন দূর থেকে বহুদূর।

(২) কঠোর পরিশ্রম: পরিশ্রমই সফলতার জনক। পরিশ্রম ছাড়া সফলতা অর্জন করতে চাওয়াটা অন্ধকারে ঢিল মারার নামান্তর। আপনার তো অনেক ইচ্ছা, বুকভরা অভিলাষ আর আকাশছোঁয়া স্বপ্ন। তাহলে আপনি উদাসীন চিত্তে আর নির্লিপ্ত বদনে আপনার মূল্যবান সময়গুলো অবহেলায়, অবলীলায় আর অলসতায় কাটিয়ে দিচ্ছেন কেন? আপনি তো ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধারে মিইয়ে যাচ্ছেন। আপনার মন-মাঝারে পুঞ্জীভূত স্বপ্নগুলো তো নদীর পানিতে ভেসে যাচ্ছে।

সুতরাং আপনি জেগে উঠুন। দ্রুত একটি নৌকা বানিয়ে আপনার ভাসমান স্বপ্নগুলো নিয়ে নীড়ে ফিরে আসুন। ছুঁড়ে ফেলুন অলসতার চাদর। নতুন করে জ্বলে উঠুন। পরিশ্রম করে যান নিরলসভাবে।

তারপরও আপনি হতাশ? প্রবল ইচ্ছা নিয়ে অনেক পরিশ্রম করার পরও সফলতা আপনার আশপাশেও ঘেঁষছে না। কিন্তু এতে করে যেন আপনারা চলার গতি মন্থর হয়ে না যায়, বরং আপনি ধৈর্যের ভ্যাকসিন নিয়ে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু

* অধ্যয়নরত, মাদ্রাসাতুল হাদিস, নাজির বাজার, বংশাল, ঢাকা।

১. ছহীহ বুখারী, হা/১।

করুন। আপনার পরিশ্রমকে আরো গতিশীল করে তুলুন। আপনি দেখে নিয়েন, একদিন না একদিন সফলতা আপনার পদচুম্বন করবেই, ইনশা-আল্লাহ! স্বয়ং আল্লাহ আপনাকে কথা দিচ্ছেন, ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ 'মানুষের জন্য কেবল তা-ই রয়েছে, যা সে চেষ্টা করে' *(আন-নাজম, ৫৩/৩৯)*।

প্রিয় ভাই আমার! সফলতা কিন্তু একদিনেই আসে না। বরং ব্যর্থতার সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে, অতল সিন্ধুর উথালপাতাল ঢেউয়ের মাঝে সাঁতার কাটতে কাটতে একদিন দেখা মিলবে সফলতার।

সুতরাং একদিন ব্যর্থতার এ আঁধার কেটে যাবে, একটি নতুন ভোর আসবে। নিজের অজান্তেই আপনার হৃদয়ের ছাদে পতপত করে উড়তে থাকবে সাফল্যের পতাকা।

(৩) রবের সাথে গভীর সম্পর্ক: আমরা চাইলেই সবকিছু করতে পারি না। আপনি চাইলেই আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেরা' ছাত্রের খেতাব অর্জন করতে পারবেন না, চাইলেই পারবেন না গুলশানের মতো এলাকায় রাতারাতি অনিন্দ্য সুন্দর চোখধাঁধানো একটি দালান নির্মাণ করতে; কিন্তু এমন একজন আছেন, যিনি সবকিছুই করতে পারেন। এ জগৎ সংসারে এমন কিছু নেই, যা তাঁর সাধ্যের বাইরে; বরং প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর রয়েছে তার একচ্ছত্র আধিপত্য, যিনি 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর'।

যদি সেই মহান সত্তা আপনার মনের কথাগুলো শোনার জন্য প্রথম আসমানে নেমে আসেন, তখন আপনার কেমন লাগবে? যদি স্বয়ং তিনিই আপনার চাওয়াগুলো পূরণ করার জন্য আপনাকে ডাকতে থাকেন, তখন আপনার কেমন লাগবে?

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন, 'মহান আল্লাহ প্রতিদিন রাতের শেষ প্রহরে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন'।[২]

সুতরাং এই সময়টিই হতে পারে আপনার আর বিশ্বজগতের অধিপতি মহান আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার সুবর্ণ সুযোগ।

আমাদের সালাফগণ, যারা যুগ যুগ ধরে আমাদের মাঝে অমর হয়ে আছেন, যাদের গবেষণালব্ধ অনবদ্য সব গ্রন্থ পড়ে আমরা উপকৃত হয়ে আসছি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা কিন্তু এই চমৎকার সময় অর্থাৎ ক্বিয়ামুল লায়ল বা তাহাজ্জুদকে পুঁজি করেই সফলতার চূড়ায় পৌঁছতে পেরেছিলেন।

তাই সবার আগে আপনাকে রবের সাথে সম্পর্ক গড়তে হবে, তাঁর মন জয় করতে হবে আর রাতের শেষ প্রহরের এই চমৎকার সময়টিই হলো রবের সাথে সম্পর্ক গড়ার, গভীর মিতালিতে ডুব দেওয়ার এবং তাঁর সাথে নিভৃতে আলাপনের মোক্ষম সুযোগ।

তাই আজ থেকে রাত্রি নিঝুম হলে চুপিচুপি বিছানা থেকে উঠে পড়ুন, সুন্দর করে ওযূ করে জায়নামাযটা বিছিয়ে দাঁড়িয়ে যান মহান রবের সামনে। কাঁপা কাঁপা হৃদয়ে আর ভেজা ভেজা চোখে এক অসীম ব্যাকুলতা নিয়ে হাত দুটো তুলুন। তারপর মনের কথাগুলো, হৃদয়ের ব্যথাগুলো তুলে ধরুন মহান রবের দরবারে।

সুধী পাঠক! যখন আপনার মাঝে এই তিনটি সূত্রের সংমিশ্রণ ঘটবে, তখন আপনার হৃদয়ের রাজপথে শুরু হবে বিজয়ের মিছিল। চারিদিকে বেজে উঠবে সাফল্যের জয়গান, ইনশা-আল্লাহ!

হালাল চয়েস ফুড

আমাদের পণ্য সমূহ
১০০% খাঁটি

রকমারি ফুলের মধু	অন্যান্য জিনিস
সরিষা ফুলের মধু	আখের গুড়
লিচু ফুলের মধু	মৌসুমের খেজুরের গুড়
বরই ফুলের মধু	মধুময় বাদাম
কালোজিরা ফুলের মধু	উন্নত মানের খেজুর
মিক্স ফুলের মধু	সরিষার তেল
পাহাড়ী ফুলের মধু	কালোজিরা তেল
সুন্দরবন বিখ্যাত খলিশা ফুল	জয়তুন তেল
চাকের মধু	যবের ছাতু
	দানাদার ঘি
	বিভিন্ন ইসলামী বই পাওয়া যায়

সকল জেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়
যোগাযোগ করুন!
০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২
প্রোপাইটার
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূন
ঠিকানা : ছোটবনগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/ নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun
১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

২. ছহীহ বুখারী, হা/১১৪৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৫৮।

শিশুদের মোবাইল আসক্তির কারণ ও প্রতিকার

*-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী**

বর্তমান আধুনিক বিশ্বে মোবাইল আমাদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার কারণে ছোট বড় সবার হাতে হাতে আজ স্মার্টফোন। কিন্তু এই স্মার্টফোন আমাদের স্মার্ট করলেও বর্তমান সময়ের শিশুদের জন্য আজ তা কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই স্মার্টফোনের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে শিশুদের মধ্যে মোবাইলের ভয়ংকর আসক্তি দেখা দিয়েছে। যা ধর্মীয় ও সুস্থ মানসিক বিকাশের অন্তরায়। তাই শিশুদের মোবাইল আসক্তির কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আমাদের জানা জরুরী।

শিশুদের মোবাইল আসক্তির কারণ:

শিশুরা মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়ার অনেক কারণ রয়েছে। বর্তমান ডিজিটাল যুগে মোবাইল ফোন ও ট্যাবলেট শিশুদের জন্য খুবই আকর্ষণীয় একটি খেলনা হয়ে উঠেছে। কিন্তু মোবাইলই কেন তাদের খেলার বা বিনোদনের মূল উৎস তা জানা জরুরী।

১. মোবাইলের আকর্ষণ: বর্তমান সময়ে মোবাইলে অনেক চিত্তাকর্ষক উপাদান বিদ্যমান। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের গেমস, নানান ধরনের ভিডিও, সোশ্যাল মিডিয়াসহ শিশুদের আকর্ষণ করে এমন হাজারো বিষয় রয়েছে, যা এখন মোবাইলে পাওয়া যায়। যেকারণে শিশুরা খেলাধুলার পরিবর্তে বিনোদন হিসেবে মোবাইলকে বেছে নিচ্ছে।

২. বাবা-মায়ের ব্যস্ততা: আকর্ষণীয় বিষয়ে শিশুদের আগ্রহ থাকবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের বাবা-মায়েদের ব্যস্ততার কারণেই মূলত শিশুরা মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়ছে বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের ব্যস্ততার কারণে শিশুরা একা থাকে তাই মোবাইলই তাদের একমাত্র বিনোদনের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

৩. সামাজিক চাপ: মোবাইলটা আজকাল ফ্যাশন না হলেও শিশুদের ক্ষেত্রে এটা একধরনের গর্বের বিষয়। তাই সমবয়সি শিশুরা মোবাইল ব্যবহার করলে তা যেকোনো শিশুর কাছে ঈর্ষার বস্তু। তাই বন্ধুদের মধ্যে মোবাইল ব্যবহারের প্রতিযোগিতা শিশুদের মোবাইলে আসক্তি বাড়িয়ে দেয়।

৪. করোনার প্রভাব: শিশুদের বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের হাতে মোবাইল বেশি পৌঁছে গেছে করোনার সময়। ঐ সময় পুরো পৃথিবী স্থবির হয়ে পড়েছিল। পড়াশোনা, চাকরিবাকরি, বাইরে যাওয়া-আসা সবকিছুই একপ্রকার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে পুরো পরিবার যখন ঘরবন্দী হয়ে গেছে, তখন মোবাইল ছাড়া সময় কাটানোর আর কোনো বিকল্প ছিল না। এই করোনাকালীন সময়টি একটি প্রজন্মকে মোবাইলবন্দী করে দিয়ে গেছে। যার প্রভাব এখনো পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ।

৫. পড়াশোনায় তথ্য-প্রযুক্তি: দিনদিন তথ্য-প্রযুক্তির উন্নতির কারণে পড়াশোনায় ব্যাপকভাবে মোবাইলের ব্যবহার বেড়ে গেছে। বিশেষ করে করোনাকালীন এবং করোনা পরবর্তী সময়ে পড়াশোনায় মোবাইল ব্যবহার হচ্ছে। যার ফলে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্টের জন্য প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্যতামূলক মোবাইল ব্যবহার করতে হচ্ছে। একইসাথে অনলাইন ক্লাসের কারণেও শিক্ষার্থীদের মোবাইল ব্যবহার করতে হচ্ছে। এছাড়াও স্কুল-কলেজের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের জন্যও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোবাইল ব্যবহার বাধ্যতামূলক হওয়ায় শিশুরা মোবাইলকে শিক্ষার অংশ হিসেবে গ্রহণ করছে।

৬. পরিবারের অন্যদের মোবাইল ব্যবহার: আজকাল পরিবারের প্রায় প্রতিটি সদস্যদের কাছে মোবাইল রয়েছে। ফলে তারা শিশুদের সময় না দিয়ে মোবাইলে বেশি সময় দেয়। যা শিশুরা অনুকরণ করে এবং তারাও মোবাইল ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

৭. মস্তিষ্কের বিক্রিয়া: মোবাইলে গেম খেলা বা ভিডিও দেখার সময় মস্তিষ্ক থেকে ডোপামিন নামক একধরনের রাসায়নিক নিঃসৃত হয়, যা মানুষকে আনন্দ দেয় এবং আবারো মোবাইল ব্যবহার করার ইচ্ছা জাগায়। ফলে কোনো শিশু একবার মোবাইলে মজা পেয়ে গেলে তা বারবার দেখার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে।

শিশুদের মোবাইল আসক্তির ক্ষতিকর দিক:

শিশুদের মোবাইল আসক্তি একটি গুরুতর সমস্যা, যা তাদের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক বিকাশে বিরূপ প্রভাব ফেলে। যেমন—

১. চোখের সমস্যা: দীর্ঘক্ষণ মোবাইল স্ক্রিনের দিকে তাকানোর ফলে চোখের পেশি ক্লান্ত হয়ে যায়, চোখের

* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

আর্দ্রতা কমিয়ে শুষ্ক করে তুলে, ফলে ক্রমান্বয়ে দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। আর তাই বর্তমান সময়ে শিশুদের চোখে অতিরিক্ত চশমা পরার প্রবণতা বেড়ে গেছে।

২. ঘুমের সমস্যা: মোবাইলের আলো এবং নোটিফিকেশন মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখে, ফলে শিশুরা ভালো করে ঘুমাতে পারে না। এর ফলে তাদের মনোযোগ কমে যায়, মেজাজ খিটখিটে হয় এবং শারীরিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়।

৩. শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা: মোবাইলে ব্যস্ত থাকার কারণে শিশুরা খেলাধুলা, বাইরে বের হওয়া ইত্যাদি শারীরিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে। ফলে তাদের শরীর সুস্থ থাকে না এবং মোটা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

৪. মেরুদণ্ডের সমস্যা: দীর্ঘ সময় একই পোজে বসে মোবাইল ব্যবহার করার ফলে মেরুদণ্ডে ব্যথা এবং অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৫. মনোযোগ ঘাটতি: মোবাইলের নানা ধরনের বিজ্ঞাপন এবং নোটিফিকেশন শিশুর মনোযোগ কেড়ে নেয়। একইসাথে নিত্যনতুন গেমস খেলা বা গেমসের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য তাদের মন সবসময়ই উতলা হয়ে থাকে। যারা নিয়মিত ভিডিও দেখে, তারা ভিডিও দেখার জন্য সবসময়ই ছটফট করতে থাকে। এইসব কারণে তারা পড়াশোনা বা অন্য কোনো কাজে মনোযোগ দিতে পারে না।

৬. উদ্বেগ ও বিষণ্নতা: যারা অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়া এবং অনলাইন গেম খেলে, তাদের বেশিরভাগই উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ন হয়ে পড়ে।

৭. একাকিত্ব: মানুষ সামাজিক জীব। সে তার আশেপাশের মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু যারা একাকী বাসায় থাকার কারণে বাস্তব জীবনের বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোর পরিবর্তে মোবাইলে ব্যস্ত থাকে, সেইসব শিশু একসময় একাকিত্ব বোধ করে।

৮. আগ্রাসী আচরণ: বর্তমান সময়ের অধিকাংশ গেমই হচ্ছে চ্যালেঞ্জিং, দুর্ধর্ষ এবং ধ্বংসাত্মক। এইসব ভয়ংকর আগ্রাসী ভিডিও গেমস এবং অনলাইন কনটেন্টের প্রভাবে শিশুদের আচরণ ধীরে ধীরে আগ্রাসী হয়ে ওঠে।

৯. খিটখিটে মেজাজ: বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, মোবাইলে আসক্ত শিশুদের ঘনঘন মেজাজ পরিবর্তন হয়। কোনো কারণ ছাড়াই রেগে যাওয়া, অনিয়মিত ও অপর্যাপ্ত ঘুম, মনোযোগ হারিয়ে ফেলা, ভুলে যাওয়া, পরিপূর্ণ ভাষার দক্ষতা না হওয়া এবং সহোদর ভাইবোন, বাবা-মা, সহপাঠী ও বন্ধুদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাসহ বিভিন্ন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি হয়।

১০. অসামাজিক জীবনযাপন: বাস্তব জীবনের সামাজিক যোগাযোগের পরিবর্তে ভার্চুয়াল জগতে সময় ব্যয় করার কারণে শিশুরা সামাজিক দক্ষতা হারিয়ে ফেলে। মোবাইলে সময় দেওয়ার কারণে শিশুরা তাদের সমবয়সিদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পায় না। ফলে তারা ছোট বড় সমবয়সি ইত্যাদি পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে তা শিখতে পারে না। এতে শিশুদের মধ্যে অন্যের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে জড়তা দেখা দেয়। আর তাই মোবাইলে সময় দেওয়া শিশুরা দিনদিন অসামাজিক হয়ে বড় হয়।

১১. পরিবারের সাথে সম্পর্কের অবনতি: যেসব পরিবারের অভিভাবকরা শিশুদের সময় দিতে পারে না, তারা মোবাইলে ব্যস্ত থাকে। আর মোবাইলে ব্যস্ত থাকার ফলে ঐ শিশুরা পরিবারের সদস্যদের সাথে যথেষ্ট সময় কাটাতে পারে না। এতে ধীরে ধীরে পরিবারের সাথে সন্তানদের পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

১২. শিক্ষায় মনোযোগ কমে যাওয়া: মোবাইলে ব্যস্ত থাকার কারণে শিশুরা পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না। তাদের মধ্যে সারাক্ষণ একধরনের অস্থিরতা কাজ করে। ফলে তারা পড়াশোনায় খারাপ করতে থাকে এবং মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।

১৩. অশ্লীলতা: ছোট বড় সকলেরই অশ্লীলতার প্রতি আগ্রহ থাকবে এটা স্বাভাবিক। স্মার্টফোনে চাইলেই যে কেউ যা ইচ্ছা তাই দেখতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়াগুলো এমনভাবে রোবটিং করা হয়, যাতে যে একবার যা দেখে তা তাকে বার বার দেখায়। ফলে কেউ কোনো কারণে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে একবার অশ্লীল কিছু দেখে, তাহলে সোশ্যাল মিডিয়া তাকে একই রকম কন্টেন্ট বারবার দেখাবে। ফলে শিশুরা একবার অশ্লীলতায় জড়িয়ে গেলে তারা তা বারবার দেখার লোভ সামলাতে পারে না। আর এভাবে কোমলমতি শিশুরা সবার নজর এড়িয়ে নানান অশ্লীল কন্টেন্টে জড়িয়ে যায়।

১৪. চাইল্ড বুলিং এর শিকার: শিশুরা যখন মোবাইল ব্যবহার করে, তখন তারা বুঝে না বুঝে সোশ্যাল মিডিয়ায় জড়িয়ে যায়। আর এই সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে শিশুরা নানান

ধরনের বুলিং এর শিকার হয়। যা তারা বড়দের কাছে বলতে পারে না। একসময় এইসব বুলিং তাদেরকে মানসিক সমস্যার দিকে ঠেলে দেয়।

১৫. যৌনতার দিকে ধাবিত হওয়া: ১২-১৩ বছরের কিশোর-কিশোরীরা যৌবনের প্রারম্ভে সোশ্যাল মিডিয়ায় যুক্ত হয়ে নারী-পুরুষের সম্পর্কের মেকানিজমের সাথে পরিচিত হয়ে যায়। ফলে তারা নিজেদেরকে প্রাপ্তবয়স্কদের সারিতে তুলনা করে। এতে করে ধীরে ধীরে তারা নিষিদ্ধ যৌনতার বিষয়গুলো নিরীক্ষণ করতে থাকে। যা তাদেরকে এক পর্যায়ে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

১৬. জুয়ার আসক্তি: বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে জুয়ার বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। গেমস খেলার ছলে শিশুরা না চাইলেও বিভিন্ন ধরনের জুয়ায় জড়িয়ে পড়ে। ফলে তারা ভালো-মন্দ বুঝার আগেই জুয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ে।

১৭. অপরাধ প্রবণতা: শিশুরা মোবাইলে সময় পার করার কারণে নানান ধরনের অপরাধমূলক কন্টেন্টের সাথে পরিচিত হয়। এইসব অপরাধমূলক কন্টেন্টের প্রভাবে শিশুদের মধ্যে ভায়োলেন্সের মানসিকতা তৈরি হয়। যা তাদেরকে কিশোর অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়।

শিশুদের মোবাইল আসক্তি কমানোর উপায়:

আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে চাইলে শিশুদের মোবাইল আসক্তি কমাতে পারি।

১. কারণ নির্ধারণ: শিশু কেন মোবাইল ব্যবহার করে, সেটা বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। হয়তো সে একাকিত্ববোধ করছে বা নতুন কিছু শিখতে চায়। কিংবা সে খারাপ কিছুতে জড়িয়ে গেছে ইত্যাদি। আমরা যদি তার মোবাইল ব্যবহারের কারণ উদ্ঘাটন করতে পারি, তাহলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে আমাদের জন্য সহজ হবে।

২. শিশুর সাথে সময় কাটানো: শিশুর সাথে খেলাধুলা, বই পড়া, গল্প করা ইত্যাদি করার মাধ্যমে তাকে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। যাতে করে তার মোবাইলের প্রতি আকর্ষণ কমানো যায়।

৩. মোবাইল ব্যবহারের সময় নির্ধারণ: অভিভাবকদের অবশ্যই একটি রুটিন ফলো করতে হবে। যেখানে খাওয়া-দাওয়া, পড়া-শোনা, খেলাধুলাসহ মোবাইল ব্যবহারেরও নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ থাকবে। অর্থাৎ শিশু কতক্ষণ মোবাইল ব্যবহার করবে তা নির্ধারণ করে দেওয়া।

৪. মোবাইলে উপযুক্ত কনটেন্ট: শিশুদের মোবাইল ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক হচ্ছে অনুপযুক্ত কন্টেন্ট। শিশুরা তাদের বয়সের উপযুক্ত কন্টেন্ট দেখলে তাতে শেখার অনেক কিছুই থাকবে। তাই তাদেরকে মোবাইল আসক্তি থেকে কমানোর জন্য তাদের উপযুক্ত কন্টেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে। একইসাথে শিশুদের বয়সের উপযোগী শিক্ষামূলক অ্যাপস ব্যবহার করে শিশুর শেখার প্রক্রিয়াকে মজাদার করে তুলতে হবে।

৫. সৃজনশীল কাজে উৎসাহ: দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততায় আমাদের কাছে মোবাইলের বিকল্প কিছু থাকে না বলেই শিশুরা মোবাইল ব্যবহার করে। তাই আমাদের অবশ্যই মোবাইলের বিকল্প সৃজনশীল নানান কাজে তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যাতে তারা সৃজনশীল কাজের মধ্যে আনন্দ পেয়ে তাতে ব্যস্ত থাকে।

৬. ধর্মীয় অনুশাসন: ইসলামে রয়েছে শান্তি, অর্থাৎ পরিবারে সঠিকভাবে ইসলাম পালন করলে অবশ্যই সেখানে শান্তি আসবে। তাই আমরা যদি পরিবারগুলোতে ইসলামের সঠিক চর্চা করি, তাহলে শিশুরা অবশ্যই ইসলামিক পরিবেশে বেড়ে উঠবে। যেখানে অহেতুক অপ্রয়োজনে বিনোদনের জন্য মোবাইল ব্যবহার করা হবে না। সুন্দর ধর্মীয় অনুশাসনে পরিবার চললে সেখানে শিশুরা মোবাইলে আসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

৭. পরিবারে মোবাইল ব্যবহার কমানো: একটি পরিবারে ছোট বড় সবাই যদি মোবাইল ব্যবহার কমিয়ে দেয়, তাহলে শিশুরা মোবাইল ব্যবহারে উৎসাহী হবে না। যদি একটা নিয়মের মধ্যে সবাই মোবাইল ব্যবহার করে, তাহলে শিশুরা মোবাইলে অতিরিক্ত আসক্ত হতে পারবে না।

৮. মোবাইল ফ্রি জোন: খাবারের সময়, ঘুমের আগে এবং পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সময় মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। কেননা আমরা সবাই এই সময়গুলোতে বেশি মোবাইল ব্যবহার করি।

৯. পড়াশোনার চাপ কমানো: বর্তমান প্রতিযোগিতার বিশ্বে আমরা সবাই প্রতিযোগিতা নিয়েই ব্যস্ত। আর এই প্রতিযোগিতার মধ্যে আমরা আমাদের সন্তানদেরও জোর অংশগ্রহণ করাচ্ছি। ফলে তাদেরকে পড়াশোনা এবং ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার নিয়ে শিশু বয়স থেকেই চাপে রাখছি। যা তাদেরকে

রোবটিক জীবনে নিয়ে যাচ্ছে। এতে করে শিশুরা পড়াশোনার বাইরে সৃজনশীল কাজ কিংবা খেলাধুলা করার সময় পাচ্ছে না। ফলে তারা যে অল্প সময় পায়, তাতেই ওরা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই আমরা যদি শিশুদের পড়াশোনার অতিরিক্ত চাপ না দিয়ে সৃজনশীল কাজে তাদের উদ্বুদ্ধ করি, তাহলে তাদের মোবাইল আসক্তি কমে আসবে।

১০. পুরস্কার দিন: পড়াশোনা এবং সুন্দর জীবনচর্চার জন্য শিশুদের নানান সময়ে পুরস্কৃত করতে হবে। তাই যখন শিশু মোবাইল ব্যবহার কম করে, তখন তাকে পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করতে হবে।

১১. ধৈর্য ধরা: আমরা হাজারো চাইলে বর্তমান তথ্য প্রযুক্তিকে এড়িয়ে যেতে পারি না। তাছাড়া পরিবেশ পরিস্থিতিও সবসময় অনুকূলে থাকে না। তাই চাইলেই হুট করে শিশুদের মোবাইল আসক্তি কমানো যাবে না। শিশুদের মোবাইল আসক্তি কমানোর জন্য সময় লাগতে পারে। তাই এক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

১২. শাস্তি না দেওয়া: সবকিছু শাস্তি দিয়ে বন্ধ করা সম্ভব নয়। তাই শিশুদের মোবাইল আসক্তি কমাতে হলে তাকে শাস্তি না দিয়ে বুঝিয়ে বলতে হবে কেন মোবাইল ব্যবহার কমানো জরুরী। অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারে কী কী ক্ষতি, তা বুঝিয়ে বলে তাকে মোবাইল থেকে সরিয়ে আনতে হবে।

১৩. ঘরোয়া কাজ করানো: আগের দিনের মায়েরা ছোট থেকেই সন্তানদের ঘরোয়া নানান কাজ করাতেন। ফলে তারা ছোট থেকেই কর্মঠ হয়ে উঠত। কিন্তু আধুনিক সময়ের বাবা-মারা আদর করে সন্তানদের ঘরোয়া কাজে লাগান না। যদি তাদেরকে ঘরোয়া কাজে লাগানো যায়, তাহলে তারা মোবাইল আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।

১৪. প্রকৃতির সাথে যোগাযোগ: শিশুর মন-মানসিকতা ফ্রেশ রাখার জন্য তাকে বাইরের প্রকৃতির সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতে হবে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে শিশুদের নিয়ে বাইরে ঘুরতে যাওয়া তার একটি কার্যকরী উপায়। আমরা চাইলে পার্ক, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি জায়গায় শিশুদের নিয়ে যেতে পারি।

১৫. খেলাধুলায় উৎসাহ: একসময় যখন মোবাইল ছিল না, তখন সকলেই খেলাধুলা করে সময় পার করত। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে চরম বাস্তবতায় আধুনিক জীবনে আমরা খেলাধুলা থেকে সরে এসেছি। ফলে শিশুরা আগের মতো খেলাধুলা না করে ভার্চুয়াল জগতে খেলাধুলা করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই শিশুদের মোবাইল আসক্তি কমাতে হলে তাদেরকে আগের মতো মাঠের খেলাধুলায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

১৬. পর্যাপ্ত মাঠের ব্যবস্থা করা: শিশুরা মোবাইলমুখী হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে খেলার মাঠ কমে যাওয়া। তাই সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে শিশুদের জন্য মাঠের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭. উচ্চ বিলাসিতা পরিহার: শিশুদের প্রকৃত মঙ্গল চাইলে অবশ্যই অভিভাবকদের উচ্চ বিলাসিতা কমাতে হবে। বাজারে নিত্যনতুন মোবাইল আসার সাথে সাথে তা ক্রয় করা, কিংবা হাই কোয়ালিটি ফিচারযুক্ত মোবাইল ব্যবহার একধরনের উচ্চ বিলাসিতা। শিশুরা নিত্যনতুন আপডেট মোবাইল হাতে পেলে অবশ্যই তারা তা ব্যবহার করতে উৎসাহী হবে। তাই পরিবারে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর মোবাইল ব্যবহার করা উচিত।

১৮. শিশু বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তোলা: ইট পাথরের শহরে আমরা সবাই যান্ত্রিক হয়ে পড়েছি। ফলে দিনদিন শিশুদের জন্য খোলা জায়গা কমে যাচ্ছে। যে হারে খেলার মাঠ কমে গেছে, সেই হারে শিশুদের জন্য উপযুক্ত বিনোদন কেন্দ্র গড়ে উঠেনি। তাই শিশুদের সময় কাটানোর জন্য হাতের নাগালে সাশ্রয়ী শিশু বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তোলা উচিত।

১৯. শহুরে জীবন পরিহার: এটা চরম সত্য যে গ্রামের তুলনায় শহরের শিশুরা বেশি মোবাইল আসক্ত। এর কারণ শহরে শিশুদের বিনোদন ও খেলার জায়গার অভাব। তাই সন্তানকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হলে শৃঙ্খলিত শহুরে জীবন পরিহার করে গ্রাম কিংবা মফস্বলে বসবাস করা জরুরী।

শেষ কথা:

মোবাইলে আসক্ত শিশুদের হঠাৎ করে মোবাইল ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা যাবে না। তবে মোবাইল ব্যবহারের উপর নজর রাখতে হবে এবং তাকে ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ও ধর্মীয় অনুশাসনের শিক্ষা দ্বারা মোবাইল থেকে বের করে আনতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন।

কলুষিত অন্তরকে বিশুদ্ধকরণ

*-রাকিব আলী**

[১]

কারো সফলতায় বাহ্যিকভাবে খুশি হতে পারা কিংবা খুশি হতে পারার ভান করা অনেক সহজ। কিন্তু একদম মন থেকে খুশি হতে পারা এবং আরও সফল হওয়ার জন্য বিশুদ্ধ মনে দু'আ করতে পারা মোটেও সহজ নয়। এটি অনেক বড় একটি গুণ, যা সবার মধ্যে থাকে না। নিঃসন্দেহে এমন গুণ মুত্তাক্বীদের গুণ। আর এই গুণ থাকা ব্যক্তিদের অভিনন্দন জানানো উচিত।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের মধ্যে হিংসা, অহংকারের তীব্রতা এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে, আজকাল আমরা মানুষের ভালোটুকু সহ্য করতে পারি না। কাউকে কোনো কিছুতে সফল হতে দেখলেই আমাদের অনেকেরই গা জ্বালা শুরু হয়ে যায়, মনে মনে এক ধরনের কষ্ট অনুভব করতে শুরু করি। বাহ্যিকভাবে যদিও অনেক খুশি হতে পারার ভান করা হয়, তবুও তো মনের মধ্যে এক ধরনের অশান্তি থেকে যায়, বুকে চিনচিন ব্যথা করে। পক্ষান্তরে, কারো অকল্যাণ দেখলে আমরা ভিতরে ভিতরে কেমন জানি এক ধরনের সুখ অনুভব করি। মনে মনে খুশি হই, অট্টহাসি দেই। আর এগুলো সবই মুনাফেক্বীর বহিঃপ্রকাশ।

আল্লাহ তাআলা এ মর্মে বলেছেন, তাদের অর্থাৎ মুনাফেক্বদের অবস্থা হচ্ছে তোমাদের কোনো কল্যাণ হলে তাদের খারাপ লাগে, আবার তোমাদের কোনো অকল্যাণ দেখলে তারা আনন্দে ফেটে পড়ে; এ প্রতিকূল অবস্থায় যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করতে পারো এবং নিজেরা তাক্বওয়া অবলম্বন করে চলতে পারো, তাহলে তাদের চক্রান্ত (ষড়যন্ত্র) তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিবেষ্টন করে আছেন *(আলে ইমরান, ৩/১২০)*।

এই আয়াতকে সামনে রেখে আমাদের নিজেদের সাথে স্থির মনে একটু কথা বলে নেওয়া দরকার যে, আমি কি সত্যিকার অর্থেই অন্যের সফলতায় খুশি হতে পারছি নাকি আমার ভিতরে খুব জ্বালা যন্ত্রণা করে, অস্বস্তি লাগে, আমি সহ্য করতেই পারি না? যদি কারো কল্যাণ দেখলে আমাদের নিজেদের মধ্যে আসলেই জ্বালা শুরু হয়ে যায় কিংবা অন্তরে অস্বস্তিবোধ হয় এবং অকল্যাণ দেখলে অন্তরে শান্তি অনুভূত হয়, খুশি খুশি ভাব চলে আসে, তখন বুঝতে হবে আমাদের মধ্যে মুনাফেক্বী এসে গেছে, শয়তান আমাদেরকে প্রবলভাবে ডমিনেট করছে।

এমতাবস্থায় অচিরেই নিজের অন্তরের চিকিৎসা করাতে হবে। কেননা এ অন্তর 'মুনাফেক্ব' নামক অনেক জটিল এক রোগে আক্রান্ত। এমন আক্রান্ত অন্তর নিয়ে নিজেকে আর যাইহোক জান্নাতের উপযোগী করে তোলা যায় না। ফলে জরুরী ভিত্তিতে এর চিকিৎসা করাতেই হবে। আর এর চিকিৎসার জন্য দুনিয়ার কোনো ডাক্তারের কাছ থেকে প্রেসক্রিপশন নিতে হবে না। এর প্রেসক্রিপশন স্বয়ং মহান আল্লাহ তাআলাই ইতোমধ্যে বাতলে দিয়েছেন। তাহলে সেই প্রেসক্রিপশনটা কী?

সেই প্রেসক্রিপশনটা হচ্ছে কুরআনুল কারীম। অন্তরের রোগের চিকিৎসার জন্য এটিই হচ্ছে আসল এবং কার্যকরী সমাধান। ফলে এর দ্বারস্থ হতেই হবে। একমাত্র কুরআনই মানুষের অন্তর পরিবর্তন করে দিতে পারে, আল্লাহর সাথে সরাসরি কানেকশন তৈরি করে দিতে পারে। কেননা কুরআনের প্রতিটি কথাই মানুষের অন্তরে তাক্বওয়া তথা আল্লাহ ভীতির সৃষ্টি করে।

মানুষের অন্তরে যখন আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়, তখন সে পাপ কাজ করতে পারে না। তখন তার প্রতিটি কাজের মধ্যে তার নিজের মনিটরিং থাকে। তখন সে কুরআনের আয়াতের সাথে নিজের কর্মকাণ্ড মিলিয়ে নিয়ে নিজেকে বিশুদ্ধ পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে। এই সবকিছুর মূলেই তো তাক্বওয়া। তাক্বওয়াই মানুষকে নেক্কার বান্দা হিসেবে গড়ে তুলে, অন্তরকে কলুষমুক্ত রাখে, বান্দার অবস্থান তার রবের কাছাকাছি নিশ্চিত করে।

আল্লাহ তাআলা ওই আয়াতের শেষাংশে আরও বলেছেন যে, কেউ যদি আমাদের কারো কল্যাণে অখুশি হয় আবার অকল্যাণে খুশি হয়, তখন আমাদেরকে দুটি কাজ করতে হবে। প্রথমত, মনোবল হারিয়ে না ফেলা বা ভেঙে না পড়া তথা ধৈর্যধারণ করা। দ্বিতীয়ত, চলার পথে তাক্বওয়া অবলম্বন করা। অর্থাৎ আল্লাহর সমস্ত আদেশ নিষেধ যথাযথভাবে মেনে চলার মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করে চলা। ব্যাস! এতটুকুই আমাদের কাজ। বাকিটা আল্লাহ তাআলাই কোনো না কোনোভাবে করে দিবেন। এ ব্যাপারে আমাদের চিন্তা করার কোনো কারণ নেই।

---

* আম্বরখানা, সিলেট।

www.al-itisam.com

অধিকন্তু, আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন যে, তিনি দুষ্টদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিবেষ্টন করেই আছেন। অর্থাৎ তারা আল্লাহর বাউন্ডারিতেই আছে, যেকোনো সময়ই আল্লাহ তাদেরকে ধরে ফেলবেন। তাই আমাদের এতে চিন্তা কীসের? আল্লাহই তো আমাদের হেফাযতকারী, উত্তম অভিভাবক।

[২]

অনেক সময় ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও মনের মধ্যে হিংসা-অহংকার চলে আসে। যেহেতু দুনিয়া হচ্ছে একটি পরীক্ষার ক্ষেত্র। আর হিংসা-অহংকার হচ্ছে সেই পরীক্ষার প্রশ্ন। তাই পরীক্ষার প্রশ্ন হিসেবে মনের মধ্যে হিংসা-অহংকার চলে আসা দূষণীয় কিছু নয়। তবে দোষ তখনই হবে, যখন আপনার হিংসা-অহংকার মানুষের ক্ষতির কারণ হবে, যখন আপনি এগুলোকে অন্তরে ঠাঁই দিবেন। এজন্য নিজের সাথে কথা বলে নিশ্চিত হবেন যে, আমি কি হিংসা করছি? আমার কি কোনো কাজে অহংকার হয়ে যাচ্ছে? হিংসা ও অহংকার নামক সেই প্রশ্নদ্বয়ের সঠিক উত্তর হচ্ছে হিংসার বশবর্তী হয়ে কারো কোনো ক্ষতি না করা, ক্ষতির চিন্তা পর্যন্ত না করা। নিজেকে বড় মনে না করা, সত্যকে প্রত্যাখ্যান না করা। মোটকথা, এমন কিছু না করা, যার ফলে অহংকার প্রকাশ পায়। সহজ ভাষায়, হিংসা ও অহংকার থেকে নিজেকে কন্ট্রোল করাই হচ্ছে এ দুটো প্রশ্নের উত্তর।

মনের মধ্যে হিংসা চলে আসলে আপনার করণীয় হচ্ছে, যে মানুষের প্রতি আপনার হিংসা হচ্ছে সে মানুষের জন্য বেশি বেশি করে দু'আ করা। আপনি যখন হিংসা না করে অন্যের জন্য মঙ্গলের দু'আ করবেন, তখন ফেরেশতারা আপনার মঙ্গলের দু'আ করবেন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি তার অন্য ভাইয়ের আড়ালে তার জন্য দু'আ করে, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, আমীন এবং তোমার জন্যও তাই হোক, যা তুমি তোমার ভাইয়ের জন্য দু'আ করলে।[১]

কারো প্রতি মনের মধ্যে হিংসা আসলে তার জন্য এভাবে দু'আ করতে পারেন যে, **ও আমার রব! আমার মধ্যে যার প্রতি হিংসা হচ্ছে, তাকে তুমি সবসময় ভালো রেখো এবং তাকে সমস্ত ক্ষতি থেকে হেফাযত করে রেখো।** বিশ্বাস করুন, এভাবে দু'আ করলে আপনার অন্তরে অন্যরকম এক শান্তি অনুভূত হবে। আর মজার বিষয় হচ্ছে, আপনার সাথে না পেরে শয়তান তখন বেইজ্জত হয়ে আপনার কাছ থেকে চুপি চুপি পালাবে।

একই সাথে, নিজের মনকে এভাবেও বোঝাতে পারেন যে, ও মন আমার! অন্যের যে জিনিস নিয়ে তুমি হিংসা করছ, বুকে চিনচিন ব্যথা অনুভব করছো, সে জিনিস যেই আল্লাহ তাকে দান করেছেন, সেই আল্লাহ চাইলে তোমাকেও একই জিনিস দান করতে পারেন। এমনকি তোমাকে তার চেয়েও এমন উত্তম কিছু দান করতে পারেন, যা তোমার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। অতএব তুমি অন্যের প্রতি হিংসা না করে একটু সবর করো।

পক্ষান্তরে, মনের মধ্যে অহংকার চলে আসলে মনকে এভাবে বোঝাতে পারেন যে, ও মন! তুমি এতটাই দুর্বল যে, প্রতিদিন তোমাকে কয়েকবার তোমার নিজের প্রস্রাব-পায়খানার মতো দুর্গন্ধময় জিনিস পরিষ্কার করতে হয়। এছাড়া, এই মুহূর্তে মালাকুল মঊতের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়ে গেলে কিছুক্ষণ পরই তুমি পোকামাকড়ের খাবার হতে চলছ। ফলে তোমাকে দিয়ে মোটেও অহংকার সাজে না গো মন। তুমি নিজেকে নিয়ে অহংকার না করে নিজের চোখে নিজেকে ছোট হিসেবে দেখো এবং নিজের ঈমান আমল এমনভাবে সাজাও যেভাবে সাজালে তোমার রব মানুষের দৃষ্টিতে তোমাকে বড় করে দেবেন।

[৩]

আপনি যদি আপনার অন্তরকে শিরক, বিদআত, হিংসা, অহংকার মুক্ত অর্থাৎ পাক্কা বিশুদ্ধ রাখতে পারেন, তবে রবের পক্ষ থেকে আপনার জন্য বিরাট এক সুখবর রয়েছে। সে সুখবর সম্মানের সুখবর। অন্তরকে কলুষমুক্ত রাখতে পারলে আপনার জন্য অনেক বড় এক সম্মান অপেক্ষা করছে। আপনি কি জানেন, সেটা কী? যাদের অন্তর পবিত্র, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে রব্বে কারীম বলেছেন, সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর কাছে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আসবে। সেদিন জান্নাতকে আল্লাহভীরুদের একান্ত কাছে নিয়ে আসা হবে *(আশ-শুআরা, ২৬/৮৯-৯০)*।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ চাইলে কিন্তু এটা বলতে পারতেন যে, বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আসলে তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। এটা বলাই যথেষ্ট ছিল। কারণ জান্নাতে প্রবেশ করা এমনিতেই সম্মানের বিষয়। কিন্তু রহমানুর রহীম তার মুত্তাক্বী বান্দাদেরকে আরও বেশি সম্মান দিয়ে বলেছেন, মুত্তাক্বীদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে না, বরং জান্নাতকে মুত্তাক্বীদের কাছে নিয়ে আসা হবে। সুবহানাল্লাহ! বান্দার জন্য রবের পক্ষ থেকে এর চেয়ে বড় সম্মানের বিষয় আর কী হতে পারে, ভাবুন তো। এখন এমন বিষয় জানা সত্ত্বেও কি আমরা আমাদের অন্তরকে শিরক-বিদআত মুক্ত রাখতে তৎপর হব না? এরপরও কি আমরা আমাদের অন্তরকে অহংকার থেকে হেফাযত করব না? শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাআলা অন্তর বিশুদ্ধকারী বান্দাকে এত বেশি সম্মান দিবেন—এমনটা জেনেও কি আমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকব না? ভাবুন, পরিবর্তনের মানসিকতা নিয়ে নিজেকে নিয়ে আরও ভাবুন।

---

১. আবূ দাঊদ, হা/১৫৩৪।

পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ: যেখানে আমরা সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে

*-সাঈদ আল মাহমুদ**

আপনি কি কখনও এমনটা ভেবেছেন, কেন আজকাল মানুষ এত বিভ্রান্ত, আতঙ্কিত বা বিভক্ত? কেন আমরা নিজেরাই নিজের শত্রু হয়ে উঠছি? এসবের পেছনে রয়েছে এক আধুনিক যুদ্ধের ধরন, যাকে বলা হয় 'ফিফথ জেনারেশন ওয়ারফেয়ার' (Fifth Generation Warfare) বা পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ।

আজকের দুনিয়ায় যুদ্ধ আর আগের মতো হয় না। আগের যুদ্ধ মানেই ছিল সেনাবাহিনী, বন্দুক, ট্যাংক, ঢাল, তলোয়ার আর রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্র। কিন্তু এখন যুদ্ধ হয় আরও সূক্ষ্ম, নিঃশব্দ এবং অদৃশ্য উপায়ে। আপনি হয়তো প্রতিদিনই আক্রান্ত হচ্ছেন, কিন্তু কোনো গুলি বা রক্তপাত ছাড়াই। আসলে আপনার বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস ও চিন্তাশক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয় হচ্ছে। এটাই হলো পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ। আপনি হয়তো বুঝতেই পারছেন না, অথচ আপনি এই যুদ্ধের শিকার হয়ে পড়ছেন প্রতিদিন। এই যুদ্ধের নাম 'পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ'। এখন সংক্ষিপ্তাকারে একে একে সকল প্রজন্মের যুদ্ধ নিয়ে কিছু বলা যাক।

(ক) প্রথম প্রজন্মের যুদ্ধ (1st Generation Warfare):

প্রথম প্রজন্মের যুদ্ধ ছিল খুবই সোজাসাপ্টা ও ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতির। এতে দুই পক্ষের সেনাবাহিনী সারিবদ্ধ হয়ে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করত। বন্দুক, ঢাল, তলোয়ার, বর্শা এসব ছিল যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র। যুদ্ধের কৌশল ছিল শৃঙ্খলা ও সংখ্যায় এগিয়ে থাকা। সেই যুগের যুদ্ধগুলো মূলত রাজতন্ত্রের মধ্যে সংঘটিত হতো। যেমন- নেপোলিয়নের যুদ্ধ বা ইউরোপের উপনিবেশিক যুদ্ধগুলো ছিল এই প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) দ্বিতীয় প্রজন্মের যুদ্ধ (2nd Generation Warfare):

দ্বিতীয় প্রজন্মের যুদ্ধের সময়কাল জুড়ে দেখা যায় প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং গোলাবারুদের উপর নির্ভরতা। এতে ফায়ারপাওয়ার বা কামান, মেশিনগানের মতো অস্ত্র ব্যবহার করে দূর থেকে শত্রুকে ধ্বংস করা হতো। সৈন্যরা ট্রেঞ্চ বা খন্দকে লুকিয়ে যুদ্ধ করত। এই যুদ্ধগুলো অনেক সময় স্থবির ও দীর্ঘস্থায়ী হতো এবং এতে হতাহত বেশি হতো। যেমন- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল দ্বিতীয় প্রজন্মের যুদ্ধের উদাহরণ।

(গ) তৃতীয় প্রজন্মের যুদ্ধ (3rd Generation Warfare):

তৃতীয় প্রজন্মের যুদ্ধকে বলা হয় 'চলনভিত্তিক যুদ্ধ' (Maneuver Warfare)। এই যুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল গতি ও পরিকল্পনা দিয়ে শত্রুর ঘাড়ে এসে পড়া, তাকে ঘিরে ফেলা। ফ্রন্টাল অ্যাটাকের বদলে পাশ থেকে আক্রমণ করা, বুদ্ধি দিয়ে যুদ্ধ জয় করাই ছিল কৌশল। ট্যাংক, যুদ্ধবিমান, প্যারাট্রুপার এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত এলাকা দখল করা হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির ব্লিটজক্রিগ (Blitzkrieg) বা বিদ্যুৎগতির হামলা ছিল এই কৌশলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(ঘ) চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ (4th Generation Warfare):

চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ অনেকটাই ভিন্ন ধরনের। এটি আর শুধু রাষ্ট্র বনাম রাষ্ট্রের যুদ্ধ নয়; বরং এখন যুদ্ধ হয় রাষ্ট্র বনাম বিদ্রোহী গোষ্ঠী, গেরিলা দল কিংবা সন্ত্রাসীদের মধ্যে। সরাসরি যুদ্ধের বদলে এখানে থাকে চোরাগোপ্তা হামলা, প্রচারযুদ্ধ ও ধর্মীয় বা আদর্শিক লড়াই। মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের মন-মানসিকতা প্রভাবিত করাও এর অংশ। ভিয়েতনাম যুদ্ধ, আফগানিস্তানে তালেবান বা মধ্যপ্রাচ্যের জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর কার্যক্রম চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের দৃষ্টান্ত।

(ঙ) পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ (5th Generation Warfare):

পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ সবচেয়ে জটিল ও বিপজ্জনক। কারণ এটি চোখে দেখা যায় না। এর যুদ্ধক্ষেত্র হলো মানুষের মন এবং অস্ত্র হলো তথ্য, গুজব, ভুয়া সংবাদ, সোশ্যাল মিডিয়া, সংস্কৃতি, সিনেমা এমনকি জনপ্রিয় গানও। এখানে কেউ গুলি ছুঁড়ে না; তবুও এর মাধ্যমে মানুষের বিশ্বাস, চিন্তা ও মননকে ধ্বংস করা হয়। মানুষ নিজের ধর্ম, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয় নিয়েই সন্দিহান হয়ে পড়ে। এটি এমন এক যুদ্ধ, যেখানে মানুষ নিজের অজান্তেই পরাজিত হয়।

---

* এমএ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; প্রভোস্ট ও চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রাটিভ অফিসার, মুসলিম ইউনিভার্সিটি; শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

এই যুদ্ধের ভয়ংকর দিক হলো- এখানে শত্রু কারা আপনি তাদের চিনেন না; গোলাবারুদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তথ্য, আবেগ, গল্প আর বিভ্রান্তি। অর্থাৎ আপনার চিন্তা, অনুভূতি, ও বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যুদ্ধ হচ্ছে আপনার মাথার ভিতরে। যেটা নোয়াম চমস্কি তার বহু বই ও বক্তৃতায় বলেছেন যে, জনগণের চিন্তা ও মতামত নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার ও কর্পোরেশনগুলো বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। বিশেষ করে তার বই 'Manufacturing Consent' এবং 'Necessary Illusions' বইয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, মূলধারার মিডিয়া, বিজ্ঞাপন, বিনোদন শিল্প, এমনকি শিক্ষাব্যবস্থাও অনেক ক্ষেত্রে এমনভাবে সাজানো হয়, যাতে সাধারণ মানুষ নির্দিষ্ট একটি ভাবনা, মতামত বা বিশ্বাসে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

ধরুন, আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠে ফেসবুক স্ক্রল করছেন। হঠাৎ একটি ভিডিও দেখলেন, যেখানে বলা হচ্ছে, 'এই দেশ শেষ, এই জাতি কিছুই করতে পারবে না'। আপনি হয়তো তখন বিরক্ত হন, কোনো সময় উদ্বিগ্ন হন; কিন্তু বারবার এই ধরনের পোস্ট দেখলে একটা সময় আপনি নিজের অজান্তেই বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, আমরা আসলেই অক্ষম বা দুর্বল, আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এটাই হচ্ছে Fifth Generation Warfare এর প্রধান অস্ত্র তথা মনোবল ভেঙে দেওয়া।

এখানে খুব পরিচিত একটি গল্প বলি, এক ব্যক্তি তার কাঁধে করে একটি ছাগল নিয়ে যাচ্ছিল। তিনজন দুষ্ট লোক ঠিক করল, তারা তাকে বিভ্রান্ত করবে। প্রথমজন বলল, আপনি কাঁধে করে কুকুর নিয়ে ঘুরছেন? এটা শুনে সে পাত্তা দিল না। তবে কিছু একটা ভাবল। পথিমধ্যে দ্বিতীয়জন বলল, কালো কুকুর নিয়ে ঘুরছেন যে? তার এবার একটু সন্দেহ হলো নিজের উপর। আবার কিছুদূর যাওয়ার পর তৃতীয়জন বলল, আপনি তো মানুষকে হাসাচ্ছেন! কুকুর নিয়ে ঘুরছেন আপনি। একই কথা বারবার শুনে লোকটি নিজের চোখকেই সন্দেহ করতে লাগল এবং ছাগলটিকে কুকুর ভেবে ছেড়ে দিল।

সাইকোলজির ভাষায় এটাকে বলে Gaslighting বা মানসিক ও আবেগিক নিয়ন্ত্রণের কৌশল, যেখানে কাউকে বারবার ভুল তথ্য দিয়ে, সন্দেহ ঢুকিয়ে তার নিজের উপলব্ধি, স্মৃতি বা বিচারবোধকে দুর্বল করে দেওয়া হয়। এটা এমনভাবে করা হয়, যেন সে নিজেই নিজের বোধশক্তি নিয়ে সন্দেহ করতে শুরু করে।

সহজ করে বললে, Gaslighting হলো এমন এক মানসিক খেলা, যেখানে একজন ব্যক্তি অন্যজনকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, সে নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। নিজের বিশ্বাসকে ভুল হিসেবে গণ্য করতে থাকে। বারবার মিথ্যা কথা, অস্বীকার বা অভিযোগ দিয়ে তাকে বোঝানো হয় যে, সে ভুল দেখছে, ভুল মনে রাখছে অথবা অযথা চিন্তা করছে। এভাবে মিডিয়াগুলো বিভিন্ন ভুল তথ্য ও ভুল বিশ্বাস আমাদের মাঝে পুশইন করে আমাদেরকে বোকা বানাচ্ছে।

এই যুদ্ধ কীভাবে পরিচালিত হয়?

এই যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব, নাটক-সিনেমা, এমনকি গানের কথাও। এসবের মাধ্যমে তৈরি হয় ভুল ধারণা, ভয়ের গল্প, বিভ্রান্তিকর বার্তা। যেগুলো বিবেককে বোকা বানিয়ে ধোঁকা দিয়ে আমাদের আবেগ অনুভূতি ও বিশ্বাস নিয়ে খেলা করে।

ধরুন, একজন জনপ্রিয় নায়ক বা ইউটিউবার অথবা ইনফ্লুয়েন্সার হঠাৎ করে এমন কিছু প্রচার করল, যেটা ইতিহাস বিকৃত করে। আপনারা তাকে ভালোবাসেন এবং বিশ্বাসও করেন। তাই তার কথাও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। কিন্তু আপনি জানেন না যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল বার্তা ছড়াচ্ছে কিংবা তার পেছনে কারো উদ্দেশ্য আছে অথবা সে কারো দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে বহুবার দেখা গেছে এই জিনিস।

ধরুন, আমেরিকায় ২০১৬ সালে নির্বাচনের সময় রাশিয়া ফেসবুকে ভুয়া পেজ খুলে রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়িয়ে নির্বাচনে বড় প্রভাব ফেলেছিল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও গুজব ছড়িয়ে গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে এবং প্রাণহানি পর্যন্ত হয়েছে। যেমন- ২০১৮ সালে 'ছেলেধরা' গুজবে দেশে কয়েকজন নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলা হয়েছিল।

এভাবেই Fifth Generation Warfare আপনাকে এমন কিছু করতে বাধ্য করে, যা আপনি স্বাভাবিকভাবে কখনো করতেন না অথবা তা আপনার বিশ্বাসের পরিপন্থী এবং বিবেক বিবর্জিত বিষয়।

কীভাবে এই যুদ্ধ থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন?

১. ফিল্টার করতে শিখুন: ফিল্টার করা বলতে আখ যেমন মেশিনে মাড়িয়ে ছেঁকে শুধু রসটুকু গ্রহণ করা হয়, তেমনিভাবে সবকিছু ফিস্টার করুন বা ছাঁকুন। বুঝুন যে, সব খবর, পোস্ট ও ভিডিও সত্য নয়। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আমি এটা

বিশ্বাস করলে কে লাভবান হবে? ধরুন, আপনি ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখলেন, যেখানে বলা হচ্ছে, এই নেতা দেশ বিক্রি করে দিচ্ছে। সেটা শোনার পর মনের মধ্যে রাগ কমে, কিন্তু আপনি কি জানেন ভিডিওটির উৎস কী? এটা সত্যি ঘটনা নাকি কোনো পক্ষের অ্যাজেন্ডা? যাচাই করুন, ভাবুন, তারপর বিশ্বাস করুন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো ফাসেক্ব (পাপাচারী) তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশঙ্কায় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো ক্বওমকে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/৬)*।

২. কিছু সময় নিজের ভিতরে ফিরে যান: প্রতিদিন অন্তত এক ঘণ্টা মোবাইল, টিভি, ল্যাপটপ বন্ধ রাখুন। একা থাকুন, নিজেকে প্রশ্ন করুন, আমি কে? আমি কী হতে চাই? আমি কী বিশ্বাস করি? আমি কোথায় যাব? আমার উদ্দেশ্য কী? আমি কেন এখন এখানে?

আপনাকে দার্শনিক হতে হবে, তা বলছি না। তবে নিজেকে চিনুন, জানুন। আপনার মধ্য থেকে আপনাকে খুঁজে আনুন। আর মন কী বলছে, সেটা বুঝার চেষ্টা করুন।

সেই সুরটা বুঝার চেষ্টা করুন, যে সুর আপনি জন্মের সময় পেয়েছিলেন, যে সুর আপনার সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আসছে, যে সুরে আছে বিশ্বাস, গন্তব্যের প্রতি এক অদৃশ্য টান আর অনাবিল প্রশান্তি। এই সুর আপনাকে শোনানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে আপনার পরমাত্মা।

এরপর জানুন, নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কে। আপনার সীমাবদ্ধতা কোথায় খুঁজে বের করুন। আপনার সোশ্যাল কমিটমেন্ট বা সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে চিন্তা করুন। আল্লাহর নেয়ামত অসহায় ও গরীব-মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করার অসীলা হিসেবে আপনাকে নির্বাচন করে পর্যাপ্ত অর্থসম্পদের মালিক বানানো হয়েছে। তাতে আপনি কতটুকু শুকরিয়া আদায় করেছেন? অন্যান্য সামাজিক দায়িত্ব কতটুকু পালন করতে পেরেছেন আর কতটুকু ব্যর্থ হয়েছেন?

দেখুন, আপনি কতটুকু আবেগ কন্ট্রোল করতে পারেন? আপনার নীতি-নৈতিকতা ও বিশ্বাসের উপর কতটুকু দৃঢ় থাকতে পারেন? আপনি হয়তো প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস এর 'Know Thyself' বা 'নিজেকে জানো' উক্তিটি অনেকবার শুনেছেন অথবা ইমাম গাযালীর এই বাণীটি পড়েছেন, নিজেকে বিচার (মুহাসাবা) না করলে তাযকিয়া সম্ভব নয়। সমাজ বদলাতে হলে আগে নিজেকে বদলান।

৩. ভালো মানুষের সান্নিধ্যে থাকুন এবং ভালো পরিবেশে থাকুন: যারা সবসময় হতাশা ছড়ায়, নেতিবাচকতা ছড়ায়, তাদের এড়িয়ে চলুন। ধরুন, আপনাকে কেউ সবসময় বলে, এই দেশ কখনো ভালো হবে না। সে নিজেই বিশ্বাস হারিয়েছে, এখন আপনাকেও নিচে টানছে। এমন মানুষের বদলে নিজেকে ঘিরে রাখুন এমন কাউকে দিয়ে, যারা গঠনমূলক ও ইতিবাচক চিন্তা করে এবং ইতিবাচক কাজ করে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের অনুসারী হয়। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের দেখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে'।[১]

এই হাদীছ থেকে আমরা বুঝতে পারি, আমরা যার সঙ্গে চলছি, তার প্রভাব আমাদের চিন্তা ও বিশ্বাসে পড়ে। আজকের ফিফথ জেনারেশন ওয়ারফেয়ার-এ যদি আমরা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্ত সঙ্গের মধ্যে থাকি, তাহলে আমাদেরও সেই মতবাদে ডুবে যাওয়া নিশ্চিত।

৪. হাতে-কলমে কিছু করতে শিখুন: নিজের হাতে কাজ করার অভ্যাস শুধু দারুণ আত্মতৃপ্তির উৎস নয়, বরং এটি আত্মনির্ভরতার একটি গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি। এই যুগে যখন আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত ডিজিটাল নির্ভরতা বাড়ছে, তখন হাতে-কলমে কিছু করতে পারা এক ধরনের শক্তি। ধরুন, আপনি নিজ হাতে নিজের ছাদের টবে সবজি চাষ করতে জানেন কিংবা ছোটখাটো মেরামতের কাজ নিজেই করতে পারেন, তাহলে আপনি যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারবেন।

আধুনিক সময়ে বাজারে যেসব খাবার পাওয়া যাচ্ছে, তার বড় একটি অংশই অস্বাস্থ্যকর। হাইব্রিড বীজ, রাসায়নিক সার, ফরমালিন ও বিভিন্ন বিষাক্ত উপাদানে ভরা খাদ্যপণ্য আমাদের শরীরে নীরবে ক্ষতি করছে। এর প্রভাবে ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, কিডনি ও হৃদরোগের হার আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। কিন্তু যারা নিজে খাবার উৎপাদন করতে জানেন, তারা অন্তত জানেন যে, তারা কী খাচ্ছেন। ইসলাম এই আত্মনির্ভরতার

১. আবূ দাঊদ, হা/৪৮৩৩।

ব্যাপারটিকে খুব গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে কাজ করতেন। মিক্বদাম রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিজের হাতের উপার্জন থেকে উত্তম খাবার কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহর নবী দাঊদ আলাইহিস সালাম নিজ হাতের উপার্জন থেকে খেতেন'।[২] তাঁর ছাহাবীরা অনেকেই নিজ হাতে খেজুরবাগান করতেন, ইট টানতেন। যেমনটি আমরা দেখি মসজিদে নববী নির্মাণের সময় রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজেও মাটি টানছিলেন। এতে বুঝা যায়, সম্মানজনক কাজ মানে শুধু অফিসে বসে কাজ নয়; বরং হাল চাষ করা, কাঠ কাটা, দর্জির কাজ করা কিংবা নির্মাণশ্রমিক হওয়াও সম্মানের। ইবনু খালদুন তার প্রসিদ্ধ 'মুক্বাদ্দিমা'-তে লিখেছেন, শ্রম হলো সভ্যতার ভিত্তি। শ্রম না থাকলে জ্ঞান ও অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যায়। তাই কেবল পড়ালেখা বা ডিজিটাল দক্ষতাই যথেষ্ট নয়, হাতে কাজ করার অভ্যাসও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে 'গ্রিন লাইফস্টাইল', 'আরবান ফার্মিং', 'সাস্টেইনেবল লিভিং' ইত্যাদি নিয়ে শহরাঞ্চলে অনেক আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু ইসলাম বহু আগেই আমাদের শিখিয়েছে, আল্লাহর দেওয়া প্রকৃতি ও ফিত্বরাতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবনযাপন করাই মানুষের প্রকৃত শান্তির পথ। নিজের হাতে তৈরি করা খাবার, নিজের হাতে বানানো জিনিস এগুলো শুধু শরীর নয়, মনকেও সুস্থ রাখে। এটি আত্মবিশ্বাস তৈরি করে, পরিবারে প্রশান্তি আনে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের পথ তৈরি করে।

৫. বই পড়ুন, বিশেষ করে কুরআন, হাদীছ ও ইসলামের ইতিহাস: যদি আপনি সারাদিন শুধু সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রল করতে থাকেন, তাহলে আপনার চিন্তার ক্ষমতা ধীরে ধীরে অন্যদের হাতে চলে যাবে। আপনি যা দেখছেন, তাই বিশ্বাস করতে শিখবেন; কিন্তু বই পড়লে আপনি ভাবতে শিখবেন। নিজেকে নিয়ে, সমাজকে নিয়ে, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ তৈরি হবে। আর এই চিন্তার সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে কুরআন ও হাদীছ।

কুরআন মানুষকে চিন্তা করতে শেখায়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কি চিন্তা করো না?' এই প্রশ্নটি কুরআনে বহুবার এসেছে। মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের অন্যায় ক্ষমতার বিরুদ্ধে কীভাবে সাহসের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন, ইউসুফ আলাইহিস সালাম কীভাবে কারাগারের অন্ধকারে থেকেও সত্য ও ন্যায়ের দাওয়াত দিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কীভাবে গোটা সমাজের চিন্তার ধারা বদলে দিয়েছেন— এসব গল্প শুধু-কাহিনি নয়, এগুলো জীবনের জন্য পথনির্দেশনা।

এছাড়াও ইসলামের ইতিহাসে অনেক মহামানব আছেন। যেমন- উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু, যিনি খেলাফতের সময় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অপরাজেয় বীর খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর বীর বিক্রমে যুদ্ধের কাহিনি। ছালাহউদ্দীন আইয়ূবী রাহিমাহুল্লাহ, যিনি জেরুযালেম বিজয় করেছিলেন। ইমাম গাযালী, ইবনু তায়মিয়্যাহ ও ইবনু খালদুন রাহিমাহুমুল্লাহ-এর মতো মনীষীরা জ্ঞানচর্চা এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে পুরো সমাজের চিন্তা ও জ্ঞানের কাঠামো গড়ে দিয়েছেন। তাদের লেখা বইগুলো আজও মানুষকে সঠিক পথে চলার দিকনির্দেশনা দেয়। ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, জ্ঞান একটি আলো, যা আল্লাহ যার অন্তরে চান, তাকে দেন। তাই যদি আপনি সত্যিকারের স্বাধীন চিন্তা করতে চান, নিজের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ধরে রাখতে চান, তাহলে বই পড়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। বই-ই পারে আপনাকে ভেতর থেকে গড়ে তুলতে।

৬. নিজের জীবনের গল্প নিজেই লিখুন: আপনার জীবনের নিয়ন্ত্রণ যেন কখনোই অন্য কারও হাতে না যায়। আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় বিপদ হলো মানুষ নিজের সিদ্ধান্ত নিজের জন্য নিচ্ছে ভেবে খুশি থাকে; অথচ তার বিশ্বাস, লক্ষ্য ও স্বপ্ন অনেক আগেই অন্য কারো হাতে প্রোগ্রাম হয়ে গেছে মিডিয়া, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক বা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মাধ্যমে।

ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে, প্রতিটি মানুষই আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন খলীফা বা প্রতিনিধি, যে নিজের জীবন ও আমানতের জন্য দায়বদ্ধ। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক মানুষের কাজ আমরা তার গ্রীবায় বেঁধে দিয়েছি' *(আল-ইসরা, ১৭/১৩)*। হাদীছে আছে যে, তাক্বদীর নির্ধারিত। তার মানে এই নয় যে, অন্যজনের কাছে আপনার ভাগ্যের চাবিকাঠি দিয়ে দিবেন। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে' *(আর-রা'দ, ১৩/১১)*। এবার ভাবুন, আপনি কী করবেন? আপনার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ অন্যজনের হাতে দিবেন কি-না?

২. ছহীহ বুখারী, হা/২০৭২।

আরও সহজ করে বললে, আপনার জীবন কেমন হবে, তার দায়িত্ব আপনার নিজের। আপনি যদি আপনার লক্ষ্য লিখে রাখেন, প্রতিদিন নিজেকে নিজের উদ্দেশ্য মনে করিয়ে দেন, তাহলে দুনিয়ার বিভ্রান্তি আপনাকে সহজে টলাতে পারবে না।

মনোবিজ্ঞানে একে বলা হয় Self-Authoring অর্থাৎ নিজের জীবনের গল্প নিজে পরিকল্পনা ও লিখে ফেলার প্রক্রিয়া। গবেষণা বলে, যারা নিজেদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য স্পষ্ট করে লেখে এবং তদনুযায়ী পরিকল্পনা করে চলে, তারা মানসিকভাবে স্থিতিশীল থাকে এবং বড় ধরনের বিভ্রান্তি বা চাপ সামলাতে পারে।

ইতিহাসে আমরা দেখি, ছালাহউদ্দীন আইয়ূবী রহিমাহুল্লাহ ছোটবেলায় মুসলিম ভূমি মুক্ত করার স্বপ্ন লিখে রেখেছিলেন এবং সারাজীবন সেই লক্ষ্য পূরণে কাজ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ ব্যবসায়ী হয়েও নিজের ইলম অর্জনের লক্ষ্যে এত দৃঢ় ছিলেন যে, শত শত বছর ধরে তার ফিক্বহ সারাবিশ্বে সমাদৃত।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও জীবনের প্রতিটি ধাপের জন্য সুস্পষ্ট পরিকল্পনা করেছেন—ইসলামের দাওয়াত, হিজরতের পরিকল্পনা, মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সবই ছিল লক্ষ্যভিত্তিক ও আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী।

নিজের জীবনের গল্প নিজে লিখতে গেলে তিনটি জিনিস জরুরী—

(ক) স্পষ্ট উদ্দেশ্য: আপনি কেন বেঁচে আছেন, তা জানা।

(খ) লক্ষ্যের সাথে আমল: শুধু স্বপ্ন নয়, প্রতিদিনের কাজে সেই লক্ষ্য প্রতিফলিত হওয়া।

(গ) আত্মসমালোচনা (Muhasaba): নিজের কাজের ভুলত্রুটি পর্যালোচনা করা এবং ঠিক করা।

যদি আপনি আপনার লক্ষ্য না ঠিক করেন, তবে নিশ্চিত থাকুন, কেউ না কেউ আপনার জন্য সেটা ঠিক করে দেবে আর তখন আপনি আপনার নিজের গল্পের প্রধান চরিত্র না হয়ে এক্সট্রা চরিত্রে পরিণত হবেন।

৭. আপনি যাদের গল্প দেখেন বা যাদের ভালো লাগে, তারা যেন আপনার চরিত্র গঠনে সহায়ক হয়: ধরুন, আপনি যদি সবসময় এমন সিরিজ, দেখেন যেখানে হিরো হচ্ছে একজন ঠক, লোভী, খুনি বা প্রতারক অথবা কোনো নায়িকা তথা মেয়ের পিছনে ছুটে; তাহলে আপনি নিজের অজান্তেই সেই আচরণগুলোকে স্বাভাবিক ভাবতে শুরু করবেন। তখন আপনি ভাববেন, সবাই তো এমনই করে এবং নিজের ক্ষেত্রেও এটা স্বাভাবিক বলে ধরে নিবেন। স্পাইডারম্যান, হাল্ক, থর ইত্যাদি অবাস্তব চরিত্রের উপর কেন আকৃষ্ট হন? এরকম চরিত্রগুলো কি নিজের জীবনে বা সামাজিক জীবনে আপনার কোনো উপকার করেছে? নাকি এই চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে কারো কোনো উপকার করতে পেরেছেন? তাহলে কেন দেখবেন এসব চরিত্র বা কেন আকৃষ্ট হবেন এসব অবাস্তব কিছুতে? এটাই ভয়ংকর। তার বদলে এমন চরিত্র খুঁজুন, যাদের জীবন আপনাকে অনুপ্রাণিত করে।

শেষ কথা:

পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ হচ্ছে এমন একটি যুদ্ধ, যা আপনি দেখতে পান না; কিন্তু প্রতিদিন আপনার মনন, চিন্তা, আত্মবিশ্বাস সবকিছুকে গ্রাস করে নেয়। এই যুদ্ধের শিকার আপনি, আমি, আমরা সবাই। কিন্তু আপনি চাইলে এই যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচতে পারেন। সে জন্য দরকার সচেতনতা, জ্ঞান, সাহস ও ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা। শেষে এই বার্তাগুলো মনে রাখুন—

(ক) তথ্য যাচাই করুন: বিশ্বাস করার আগে প্রশ্ন করুন, কে লাভবান হচ্ছে?

(খ) নীরবতা চর্চা করুন এবং নিজেকে চিনুন: প্রতিদিন অন্তত এক ঘণ্টা প্রযুক্তিমুক্ত সময় কাটান।

(গ) নিজেকে বুঝার চেষ্টা করুন: ভুল স্বীকার করে উন্নতির পথ ধরুন।

(ঘ) ভালো সঙ্গ ও ভালো পরিবেশ বেছে নিন: বিভ্রান্তিকর, নেগেটিভ মাইন্ডের মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করুন।

(ঙ) পাঠাভ্যাস গড়ে তুলুন: কুরআন, হাদীছ, ইতিহাস ও সাহসী মানুষদের জীবনী পড়ুন। যেকোনো নতুন সৃজনশীল জ্ঞান আহরণ করুন, কর্মমুখী জ্ঞান অর্জন করুন।

এখন তাহলে কী করবেন? জেগে উঠুন, ভাবুন আর নিজের চিন্তাশক্তিকে আপনার সবচেয়ে বড় অস্ত্র বানান। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন- আমীন!

জলবায়ুর রোজনামচা

-বাসসাম ইবনে আব্দুল আলীম
অধ্যয়নরত, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

ধরণির আনাচে-কানাচে ঘটছে দেখো দুর্যোগ কত শত
কয়টা বলব? বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, সাইক্লোন, টর্নেডো।
ইদানীং আবার খবরে দেখছি, কী যেন তার নাম?
হঠাৎ করেই মেঘটা ফেটে ডুবছে কত গ্রাম।
মেরুর শীতল বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের পানি বেড়ে,
নিম্নভূমি ডুবছে জলে, কত জানমাল নিচ্ছে কেড়ে।
ভাবছো এসব কী বলছি, করছি নাকি গল্প?
ক'দিন আগেই রাশিয়া-জাপানে ঘটলো ভূমিকম্প।
ভাবতেই পারো চারিদিকে এমন হচ্ছে কেন?
হঠাৎ করেই হয়নি এসব কারণ বলছি শোনো।
বিশ্বজুড়ে এলো যখন শিল্পের বিপ্লব
জ্বালানি পুড়ল অনলে, কার্বনে ঢাকল সব।
আজও উজাড় হচ্ছে বন, কাটা হচ্ছে সব গাছ
দূষিত হচ্ছে নদীনালা, মরছে কত মাছ।
ইচ্ছেমতো প্লাস্টিক-পলি ফেলছি যত্রতত্র
মন চাইলেই নদীতে ফেলছি নিজেদের মলমূত্র।
কারণ আরও অনেক আছে সব লেখা অসম্ভব
আমি হেথা অল্পই বললাম যতটুকু লেখা সম্ভব।
লেখাটা পড়ে দুশ্চিন্তায় গরম করো না মাথাটাকে,
উপায় খোলা আছে এখনও বাঁচাতে চাইলে পৃথিবীটাকে।
বন্ধ করি কারখানাগুলোর কার্বন নিঃসরণ,
বন্ধ করি গাছ কাটা আরও যত রকম দূষণ।
ব্যবহার করি সৌরশক্তি আর গ্রিন এনার্জি যত,
এই মৌসুমে একটা হলেও গাছ লাগাই অন্তত।
বাঁচিয়ে রাখি নদীনালা, বাঁচাই তাদের প্রাণ
তবেই আমরা গাইতে পারব সবুজ পৃথিবীর গান।

প্রতিবাদ

-আব্দুল্লাহ আল নুমান
শিক্ষার্থী, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ আস-সালাফিয়্যাহ,
জোরবাড়ীয়া, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।

দুর্নীতির কালো হাত
ভেঙে ফেলো, ভেঙে ফেলো
সব ভেদাভেদ ভুলে
প্রতিবাদের আওয়াজ তুলো।
সবাইকে সঙ্গে করে
ঝড়ের বেগে সামনে চলো।
যালেমের বিষদাঁত
সজোরে করো আঘাত,
উপড়ে ফেলো উপড়ে ফেলো।
দুর্নীতি যেথায় পাবে সেথায় ধরো
শিকল খাঁচায় বন্দি করো।
যুলমের মহাপ্রাচীর ধরো
গুড়িয়ে দাও চূর্ণ করো।
সব কিছুকে করো পাক
অপশক্তি নিপাত যাক।

হিংসা নয়, হোক প্রেমের গান

-মো. শাহাবুদ্দীন
সহকারী শিক্ষক, বেলেরমাঠ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যশোর।

হিংসা নয়, হোক ভালোবাসা,
হৃদয় ভরে দাও শান্তি-ভাষা।
শত্রুতা পুড়ুক সময়ের আগুনে,
আলোক ফুটুক মানব জাগরণে।
মানুষ যদি হয় মানুষের শত্রু,
ভেঙে পড়ে তখন সমাজের পত্র।
হিংসা জমে ক্ষণে ক্ষণে,
নষ্ট হয় সুখ অনুখনে।
হিংসা শুধু আনে বিষাদ,
করে নষ্ট জীবন-উপবাদ।
সুন্দর সব স্বপ্ন ঝরে,
অন্ধকারে হৃদয় মরে।
পথ হারায় ন্যায়ের আলো,
বিচার মরে, বাঁচে না ভালো।
মুখে মুখে উঠে শোকের গান,
হারিয়ে যায় সুখের সামান।
চলো তবে রাখি হাত হাতে,
ভুলে যাই সব হিংসা-ঘৃণাতে।
ভালোবাসার করি জয়গান,
এ জীবন হোক শান্তি দান।

বাংলাদেশ সংবাদ

দেশে ডেঙ্গুতে মৃত্যু দুইশ ছাড়াল

মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গুতে ভুগে সারাদেশে চলতি বছরে মৃতের সংখ্যা দুশোর (২০০) ঘরে পৌঁছে গেল। অন্যদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আরও ৪৯০ জন। এ নিয়ে চলতি বছরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৪৭ হাজার ৮৩২ জন। বুধবার (১ অক্টোবর) স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ডেঙ্গুতে গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া দুজনই ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) বাসিন্দা। আরও বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে নতুন আক্রান্তদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে ১৩৮ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৬০ জন, ঢাকা বিভাগে ১০০ জন, ঢাকা উত্তর সিটিতে ৭৮ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ৬৪ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ২৮ জন এবং রংপুর বিভাগে ২২ জন রোগী রয়েছেন। অন্যদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৪৭৭ জন ডেঙ্গু রোগী। এ নিয়ে চলতি বছরে মোট ছাড়পত্র পেয়েছেন ৪৫ হাজার ২৭৩ জন।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে জাতিসংঘে ভোট দিল ১৪২টি দেশ

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে বিপুল ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। 'নিউইয়র্ক ঘোষণা' নামের এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ভবিষ্যৎ ফিলিস্তীন রাষ্ট্রে হামাসের কোনো ভূমিকা থাকবে না। নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে ১৪২টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়, বিপক্ষে ভোট দেয় মাত্র ১০টি দেশ, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রও রয়েছে। ভোটদানে বিরত থাকে ১২টি দেশ। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিল ফ্রান্স ও সঊদী আরব। এতে দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের তৎপরতা জোরদার করা, গাযায় যুদ্ধ বন্ধ করা এবং হামাসকে অস্ত্রসমর্পণ করে ক্ষমতা ছাড়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। আরব লিগ ইতোমধ্যেই এ ঘোষণার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। বর্তমানে জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্যদেশের মধ্যে ১৪৯টি দেশ ফিলিস্তীন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ফিলিস্তীনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হুসেইন আল-শেখ প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, এটি আন্তর্জাতিকভাবে ফিলিস্তীনি জনগণের অধিকারের সমর্থনের প্রতিফলন। অন্যদিকে ইসরাঈল একে 'বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক সার্কাস' বলে অভিহিত করেছে।

মুসলিম বিশ্ব

গাযামুখী সুমুদ ফ্লোটিলায় ইসরাঈলের বাধায় বহু দেশে প্রতিক্রিয়া, এগিয়ে চলেছে একমাত্র জাহাজ 'ম্যারিনেট'

গাযায় ত্রাণ বহনকারী নৌবহর আটকের পর সুইডিশ জলবায়ু কর্মী গ্রেটা থানবার্গসহ শত শত কর্মীকে আটক করেছে ইসরাঈলি বাহিনী। সে বহরে প্রায় ৪০টি জাহাজ ছিল যার প্রায় সবকটিকে আটকে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ইসরাঈলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলায় (জিএসএফ) যারা ছিলেন তাদের একটি ইসরাঈলি বন্দরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং সেখান থেকে তাদের নিজ দেশে ফেরানো হবে। প্রথম নৌকাটিকে গাযার উপকূল থেকে প্রায় ৭০ নটিক্যাল মাইল দূরে আন্তর্জাতিক জলসীমায় থামানো হয়, অন্যগুলোকে আরও কাছাকাছি জায়গায় আটকানো হয়। ইসরাঈল সে এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছে, যদিও সেখানে তাদের এখতিয়ার নেই।

ইন্তিকাল করলেন সঊদী আরবের গ্র্যান্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ

সঊদী আরবের গ্র্যান্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ আল শায়খ ইন্তিকাল করেছেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।* গত ২৩ সেসপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল ১১টার দিকে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তার মৃত্যুতে দুই পবিত্র মসজিদের কর্তৃপক্ষ গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং পরিবারসহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে। ১৯৯৯ সালে সঊদী আরবের প্রধান মুফতী

হিসেবে নিয়োগ পান শায়খ আব্দুল আযীয এবং দীর্ঘদিন ধর্মীয় ও সামাজিক নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ইলমি গবেষণা ও ফতওয়া কমিটির স্থায়ী সদস্য ছিলেন এবং ১৯৮১ সাল থেকে টানা ৩৫ বছর হজের খুৎবা প্রদান করেছেন। ২০১৬ সালে বার্ধক্যজনিত কারণে অবসর নেন।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

কৃত্রিম মানব ত্বক তৈরি করল অস্ট্রেলিয়া

স্টেম সেল ব্যবহার করে প্রথমবারের মতো মানুষের ত্বকের আদলে কৃত্রিম ত্বক তৈরি করেছেন অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। এই দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন বিজ্ঞানী আব্বাস শাফী। তাঁর জন্ম ইরানে। গবেষণাগারে তৈরি কৃত্রিম ত্বকে রক্তনালি, লোমকূপ, স্নায়ু, টিস্যু স্তর ও রোগ প্রতিরোধক কোষ রয়েছে। ফলে ত্বকটি ত্বকসংশ্লিষ্ট রোগ, পোড়া অবস্থাসহ বিভিন্ন চিকিৎসায় ব্যবহার করা যাবে। কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী আব্বাস শাফী জানিয়েছেন, বিশ্বের যেকোনো স্থানে তৈরি করা কৃত্রিম ত্বকের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণবন্ত ত্বকের মডেল এটি। নতুন ধরনের এই ত্বকের সাহায্যে বাস্তবের ত্বকের মতোই জৈবিক ক্রিয়া অনুকরণ করানো যায়। ফলে এই ত্বকের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা আরও কার্যকরভাবে করা যাবে। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, মানুষের ত্বকের কোষকে স্টেম সেলের মাধ্যমে কৃত্রিম ত্বক তৈরি করা হয়েছে। এ জন্য প্রথমে স্টেম সেল ল্যাবের পেট্রি ডিশে স্থাপনের পর ত্বকের ক্ষুদ্র সংস্করণে রূপান্তর করা হয়। একে স্কিন অর্গানয়েড বলা হয়। বিজ্ঞানী আব্বাস জানান, আমরা এরপর একই স্টেম সেল ব্যবহার করে ক্ষুদ্র রক্তনালি তৈরি করেছি। সব ধীরে ধীরে ত্বকে যুক্ত করেছি। প্রাকৃতিক ত্বকের মতোই বিকশিত হয়েছে এই নমুনা। এতে ত্বকের স্তর, লোমকূপ, পিগমেন্টেশন, অ্যাপেন্ডেজ প্যাটার্নিং, স্নায়ু ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিজস্ব রক্ত সরবরাহের পথ তৈরি হয়েছে। ত্বকের মডেল তৈরি করতে বিজ্ঞানীদের সময় লেগেছে প্রায় ছয় বছর। নতুন মডেলটির বিষয়ে বিজ্ঞানী অধ্যাপক কিয়ারাশ খোসরোতেহরানি বলেন, সোরিয়াসিস, অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস ও স্ক্লেরোডার্মার মতো ত্বকের রোগ ও চিকিৎসা করা বেশ কঠিন। সেখানে এসব রোগসহ দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য নতুন মডেল আশার আলো দেখাতে সক্ষম।

দাওয়াহ সংবাদ

মক্তব অলিম্পিয়াড ২০২৬ (অডিশন রাউন্ড)

দেশব্যাপী ছহীহ-শুদ্ধ কুরআন পাঠ শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ বর্তমানে ৬০০-এর অধিক মসজিদভিত্তিক মক্তব নির্দিষ্ট সিলেবাসের আলোকে পরিচালনা করছে। আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ-এর অধীনে পরিচালিত ৬০০-এর অধিক মসজিদভিত্তিক মক্তব শিক্ষার্থীদের নিয়ে গত বছরের মতো এ বছরেও মক্তব শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছে যা 'মক্তব অলিম্পিয়াড ২০২৬' নামে পরিচিত। আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ আয়োজিত 'মক্তব অলিম্পিয়াড ২০২৬' আগামী রামাযানে দেশের স্বনামধন্য টিভি চ্যানেল ও সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রচারিত হবে। 'মক্তব অলিম্পিয়াড ২০২৬'-এর অডিশন রাউন্ডে সারা দেশব্যাপী ২১টি সেন্টারে প্রায় ১৫০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং আমাদের বিচারকগণ ২১টি সেন্টারে সশরীরে উপস্থিত হয়ে অডিশন রাউন্ডের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। অডিশন রাউন্ডের অংশ হিসেবে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ রাজশাহী-এর বায়তুল হামদ জামে মসজিদে প্রথম অডিশন রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অডিশন রাউন্ড কেন্দ্র আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ-এর পরিচালক শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক হাফিযাহুল্লাহ সশরীরে পরিদর্শন করেন ও পরীক্ষা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন। আর বাকি সেন্টারগুলোতে আমাদের বিচারকগণ পর্যায়ক্রমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, বগুড়া, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, রংপুর, কুড়িগ্রাম, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, মাদারীপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও কুমিল্লায় পরীক্ষাগ্রহণ করেন। অডিশন রাউন্ডে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ৪০ জন শিক্ষার্থী নির্বাচিত হবে গ্রুমিং রাউন্ডের জন্য এবং ৪০ জন শিক্ষার্থী থেকেই নির্বাচিত হবে আমাদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারকারী প্রতিযোগী।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণ নিয়ে আমাদের বিশ্বাস কেমন হওয়া উচিত? OCD (Obsessive Compulsive Disorder)-এর কারণে এসব বিষয়ে সন্দেহ আসে। এমতাবস্থায় করণীয় কী?

-রেদোয়ান, নোয়াখালী।

উত্তর: আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণ নিয়ে বিশ্বাসকে বলা হয় ‘তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত’। তা হলো, কুরআনে আল্লাহ তাআলা নিজেকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেভাবে আল্লাহকে বর্ণনা করেছেন, সেসব বর্ণনায় বিশ্বাস রাখা; কোনো বিকৃতি (تحريف) বা অস্বীকার (تعطيل) ছাড়া এবং কোনোরূপ নির্ধারণ (تكييف) বা তুলনা (تمثيل) করা ছাড়া। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা’ (আশ-শূরা, ৪২/১১)। আর এমন সন্দেহ হলে তার করণীয় হলো, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মানুষের মনে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে এমন প্রশ্নেরও সৃষ্টি হয় যে, এ সৃষ্টিজগত তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহকে সৃষ্টি করল কে?’ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যার অন্তরে এমন প্রশ্নের উদয় হয়, সে যেন বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪)। আরেক বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কিছু ছাহাবী তাঁর সামনে এসে বললেন, আমাদের অন্তরে এমন কিছু খটকার সৃষ্টি হয় যা আমাদের কেউ মুখে উচ্চারণ করতেও মারাত্মক মনে করে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘সত্যিই কি তোমাদের এমন মনে হয়?’ তারা জবাব দিলেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘এটিই প্রকৃত ঈমানের নিদর্শন’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৩২)।

প্রশ্ন (২): রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমার উম্মাহ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে; একটি দল জান্নাতী, বাকিরা জাহান্নামী’। প্রশ্ন হলো, জান্নাতী দল কারা? আর অন্যরা কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী, নাকি শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে যাবে? দলীলসহ জানতে চাই।

-কাউসার মাহমুদ, বংশাল, ঢাকা।

উত্তর: জান্নাতী (নাজাতপ্রাপ্ত) দল তারাই যারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর ছাহাবীদের মানহাজে চলে। নাজাতপ্রাপ্ত দল মতবিরোধ ও মতভেদের সময় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কথার দিকে ফিরে যায়, আল্লাহ তাআলার এই বাণী অনুযায়ী, ‘তোমরা যদি কোনো বিষয়ে বিরোধে লিপ্ত হও, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও— যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে থাক। এটি উত্তম এবং ফলাফলের দিক থেকে উত্তম’ (আন-নিসা, ৪/৫৯)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ‘তবে না! তোমার প্রতিপালকের কসম! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদে তোমাকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে; তারপর তুমি যা ফয়সালা করবে, তারা নিজেদের মনে তার কোনো আপত্তি পাবে না এবং সম্পূর্ণরূপে তা মেনে নিবে’ (আন-নিসা, ৪/৬৫)। নাজাতপ্রাপ্ত দল কারো কথাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কথার ওপরে অগ্রাধিকার দেয় না, আল্লাহর এই বাণী অনুসরণ করে, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে নিজেদের কিছু অগ্রাধিকার দিয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং জানেন’ (আল-হুজুরাত, ৪৯/১)। আর বাকিদের পরিণাম ভিন্ন অর্থাৎ তাদের মধ্যে কেউ চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে, যার বিদআত তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিয়েছে, সে জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। আর যারা কুফরী করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে’ (আল-বাক্বারা, ২/৩৯)। আবার কেউ কেউ জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে, তার অপরাধ সমপরিমাণ। তারপর তার ঈমান থাকার কারণে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ বলবেন, যার অন্তঃকরণে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাকে বের করো। অতঃপর তাদেরকে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে তারা পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। তাদেরকে জীবন-নদে নামিয়ে দেওয়া হবে। এতে তারা তরতাজা হয়ে উঠবে যেমন নদীর তীরে জমাট আবর্জনায় শস্যদানা গজিয়ে ওঠে’। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও বললেন, ‘তোমরা কি দেখ না, সেগুলো হলুদ রঙের বাঁকা হয়ে উঠতে থাকে?’ (ছহীহ বুখারী, হা/৬৫৬০)।

প্রশ্ন (৩): আমাদের মসজিদের ইমাম জাল হাদীছ ও সুফী আক্বীদা প্রচার করেন এবং কাচের গ্লাস দিয়ে ঝাড়ফুঁক করেন, যেখানে জিনের সহযোগিতার আলামত পাওয়া যায়। তার পেছনে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি? এ ধরনের ঝাড়ফুঁক কি শরীআতসম্মত?

-তোফায়েল আহমেদ, নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর: যদি ইমামের প্রচারিত জাল হাদীছগুলোর বিষয়বস্তু কুফরী না হয় এবং প্রচারিত সুফী আক্বীদা, যেমন- গায়রুল্লাহকে ক্ষমতা দেওয়া, আল্লাহর সঙ্গে সত্তাগত ঐক্য (ওয়াহদাতুল উজূদ) ইত্যাদি স্পষ্ট শিরক বা কুফরী বিশ্বাস না হয়, তাহলে তার পিছনে ছালাত পড়া বৈধ হবে। আর যদি জাল হাদীছগুলোর বিষয়বস্তু কুফরী হয় এবং সুফী আক্বীদাতে স্পষ্ট শিরক বা কুফরী পাওয়া যায়, তাহলে তার পেছনে ছালাত পড়া বৈধ হবে না। আর কাচের গ্লাস, জিনের নাম, অজানা ভাষা, জ্যোতিষ, বা তাবীয-কবচের মাধ্যমে যদি ঝাড়ফুঁক করা হয়; তাহলে তা শিরক এবং জিনের সাহায্য নিলে তা শিরক পর্যন্ত

পৌঁছাতে পারে। আর এ ধরনের ঝাড়ফুঁক শরীআতসম্মত নয়। আউফ ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জাহেলী যুগে ঝাড়ফুঁক করতাম। অতঃপর আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী? তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থাগুলো আমার সামনে পেশ করো; তবে যেসব ঝাড়ফুঁক শিরকের পর্যায়ে পড়ে না, তাতে কোনো দোষ নেই' (ছহীহ মুসলিম, হা/২২০০; আবূ দাঊদ, হা/৩৮৮৬)। উল্লেখ্য, জাল হাদীছ প্রচার করা নাজায়েয। তবে মানুষকে তা থেকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা যায়।

প্রশ্ন (৪) অনেকে বলেন, তাবীয পরলে দুষ্ট জিন আক্রমণ করতে পারে না আর খোলার পর তীব্র আক্রমণ করা হয়, কখনো মৃত্যুঝুঁকিও দেখা দেয়। এ অবস্থায় রোগী ও তার পরিবারের করণীয় কী?

-শাহরিয়ার নাফিজ, কুমিল্লা।

উত্তর: তাবীয ব্যবহার করা শিরক। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তাবীয ও তাবীয জাতীয় বস্তু এসব শিরক' (আবূ দাঊদ, হা/৩৮৮৩; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৪১৫১)। অন্য বর্ণনায় আছে, 'যে তাবীয ঝুলাল, সে শিরক করল' (মুসনাদ আহমাদ, হা/১৭৪০৪)। তাবীয খুললে আক্রমণ বেড়ে যাওয়ার কারণ হলো, এটা শয়তানের ধোঁকা। তাবীয থাকাকালে সে কিছুটা শান্ত রাখে, যাতে মানুষ বিশ্বাস করে তাবীয-ই রক্ষা করছে। যখন খুলে ফেলা হয়, তখন সে ভয় দেখায় এবং আক্রমণ করে, যাতে মানুষ আবার শিরকে ফিরে যায়। বাস্তবে তাবীয মানুষকে রক্ষা করে না; বরং শয়তানকে শক্তিশালী করে। এ অবস্থায় রোগী ও পরিবারের করণীয়- ১. আল্লাহর উপর ভরসা করা। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ যদি তোমাকে কষ্টে ফেলেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই' (আল-আনআম, ৬/১৭)। ২. আন্তরিকভাবে তওবা করা। তাবীয ব্যবহার করা শিরক, তাই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে আন্তরিক তওবা করো। আশা করা যায়, তোমাদের রব তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত' (আত-তাহরীম, ৬৬/৮)। মা-বাবা বা আত্মীয়-স্বজন শিরক করতে বললে তাদের কথা মানা যাবে না (লুকমান, ৩১/১৫)। ৩. তাবীয ধ্বংস করা। ৪. শারঈ রুকইয়া (কুরআন ও ছহীহ দু'আ দিয়ে চিকিৎসা) প্রতিদিন পড়া, যেমন- সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী (আল-বাকারা, ২/২৫৫), সূরা ইখলাছ, ফালাক, নাস পড়া। রাতে ঘুমানোর আগে সূরা ইখলাছ, ফালাক, নাস পড়ে পুরো শরীর মুছে দেওয়া। ৫. ঘরকে শয়তানমুক্ত রাখা, সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা। ৬. আযান দেওয়া। ৭. ছবি, মূর্তি, গান-বাজনা ইত্যাদি ঘরে না রাখা।

প্রশ্ন (৫): আমার এলাকায় মানুষ হানাফী মাযহাবের কট্টর অনুসারী। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমলের কথা বললে তারা বিরক্ত হয় ও বিরোধিতা করে। এমন পরিস্থিতিতে কীভাবে তাদেরকে কুরআন-সুন্নাহর পথে আহ্বান জানানো উচিত? আর তারা তা অস্বীকার করলে এর বিধান কী? আহলেহাদীছ নাম শুনলেই তারা বাঁকা চোখে দেখে।

-মোস্তফা মনোয়ার, হারাগাছ, রংপুর।

উত্তর: এমতাবস্থায় যথাসাধ্য ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে বুঝাতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহবান করো এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করো। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভালো করেই জানেন' (আন-নাহল, ১৬/১২৫)। দাওয়াত দেওয়ার পরও যদি জেনেশুনে তারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধিতা করে, তাহলে তারা মূলত আল্লাহ ও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণীকে অমান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আর 'আহলেহাদীছ' কোনো দল বা ব্যক্তির নাম নয়; বরং পৃথিবীতে যেখানে যারা মানুষের মতামত উপেক্ষা করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে চলে তারাই 'আহলেহাদীছ'।

প্রশ্ন (৬): আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, মৃত ব্যক্তিকে তিন দিন পর্যন্ত বিলম্ব করে দাফন করা যায়। এ বক্তব্য কি সঠিক?

-হানিফ বিন রমিজ উদ্দীন, চট্টগ্রাম।

উত্তর: কোনো জরুরী দুর্ঘটনা ব্যতীত মৃত ব্যক্তিকে দ্রুত দাফন করতে হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ" 'তোমরা জানাযার যাবতীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করো। কারণ মৃত ব্যক্তি যদি নেককার হয়, তাহলে তোমরা তাকে কল্যাণের দিকে এগিয়ে দিবে। আর যদি সে এমন না হয়, তাহলে তোমরা মন্দ বস্তুকে নিজেদের কাঁধ থেকে নামিয়ে দিবে' (ছহীহ বুখারী, হা/১৩১৫)।

প্রশ্ন (৭): আল্লাহ তাআলা সব গুনাহ ক্ষমা করেন, কিন্তু বান্দার হক্ব নষ্ট করলে ক্ষমা করেন না- এমন কথা শোনা যায়। অনেকের মৃত্যু হয়ে গেলে, তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগও থাকে না। এমতাবস্থায় কী করা উচিত?

-রেদোয়ান, নোয়াখালী।

উত্তর: 'আল্লাহ তাআলা বান্দার হক্ব নষ্টকারীকে ক্ষমা করেন না' একথা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানি বা অন্য কোনো বিষয়ে যুলমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যে দিন তার কোনো দীনার বা দিরহাম থাকবে না। সে দিন তার কোনো সৎকর্ম না থাকলে তার যুলমের পরিমাণ তা তার নিকট হতে নেওয়া হবে আর তার কোনো সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ হতে নিয়ে তা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৯)। এমতাবস্থায় যদি আর্থিক বিষয়াদি হয়ে থাকে, তাহলে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তার ওয়ারিছ না পাওয়া গেলে মৃত ব্যক্তির নামে ছাদাকা করে দিবে এবং আল্লাহর কাছে তওবা করবে।

প্রশ্ন (৮): আমরা জানি যে, বদনজর সত্য। গাড়ি, বাড়ি বা অন্য কোনো জিনিসে বদনজর লাগলে এ থেকে বাঁচার উপায় কী?

–এস. এম. আসিফ ফয়সাল, মোহাম্মদিয়া হাউজিং লি., ঢাকা।

উত্তর: বদনজর সত্য। বদনজরে মানুষের ক্ষতি হয়, যেমন- অসুস্থতা, সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়া ইত্যাদি। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বদনজর সম্পর্কে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই বদনজর সত্য। যদি কদরকে তথা ভাগ্যকে অতিক্রম করার কিছু থাকত, তবে বদনজরই তা অতিক্রম করত' (ছহীহ মুসলিম, হা/২১৮৮)। বদনজর থেকে বাঁচার পদ্ধতি সমূহ- ১. আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য পর্দা করা। পর্দা বদনজর থেকে রক্ষা করবে, ইন-শা-আল্লাহ! (আন-নূর, ২৪/৩১)। ২. আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাওয়া (আল-ফালাক্ব, ১১৩/১)। ৩. কুরআনের নির্দিষ্ট সূরাগুলো সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত তেলাওয়াত করা। যেমন- সূরা নাস, ফালাক্ব, ইখলাছ, আয়াতুল কুরসী। ৪. সকাল ও সন্ধ্যার আযকারের প্রতি যত্নবান হওয়া। ৫. প্রশংসার সময় 'মা-শা-আল্লাহ' বলা। যখন কারো সৌন্দর্য, সফলতা, সন্তান ইত্যাদি দেখবেন বা প্রশংসা করবেন, তখন 'মা-শা-আল্লাহ' বলা ইত্যাদি।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৯): রক্ত কি নাপাক? হাত কেটে রক্ত বের হলে অল্প বা বেশি হওয়ার মধ্যে কি পার্থক্য আছে? আর ছালাতের সময় রক্ত বের হলে কি ওযূ ভেঙে যায়? দলীলসহ জানতে চাই।

–নুসরাত জাহান ফাহমিদা।

উত্তর: রক্ত নাপাক। হাত বা শরীরের কোনো অঙ্গ কেটে রক্ত বের হলে (পরিমাণে কম হোক বা বেশি হোক তাতে কোনো পার্থক্য নেই) তা নাপাক (আল-আনআম, ৬/১৪৫; ছহীহ বুখারী, হা/৩০৬; মুসলিম, হা/৬৪০)। তবে ছালাতরত অবস্থায় পেশাব-পায়খানার রাস্তা ছাড়া শরীরের কোনো অঙ্গ থেকে রক্ত বের হলে ওযূ ভেঙে যাবে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম 'যাতুর রিকাআ' গাযওয়ায় ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি উবাদ ইবনু বিশর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু তীরবিদ্ধ হলেন, ফলে তার প্রচুর রক্ত বের হলো। কিন্তু তিনি সিজদা করলেন এবং নিজের ছালাত চালিয়ে গেলেন (আবূ দাঊদ, হা/১৯৮)। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ 'মুসলিমরা তাদের আঘাত ও ক্ষত অবস্থায় ছালাত আদায় করেছেন' মর্মে একটি অধ্যায় উল্লেখ করেছেন।

ছালাত

প্রশ্ন (১০): আমি ৭৮ কিমি দূরে যাব এবং সেখানে ১৫ দিনের বেশি থাকব। এ অবস্থায় ছালাত কি কছর করতে হবে?

–অন্তর, নোয়াখালী।

উত্তর: সফরে বের হয়ে যতদিন তার কাজ শেষ না হচ্ছে বা স্থায়ী থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত না নিচ্ছে, ততদিন সে কছর করতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা সফরে অবস্থানকালে উনিশ দিন পর্যন্ত ছালাত কছর করেন। সেহেতু আমরাও উনিশ দিনের সফরে থাকলে কছর করি এবং এর চেয়ে অধিক হলে পূর্ণ ছালাত আদায় করি (ছহীহ বুখারী, হা/১০৮০)। জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাবুকে বিশ দিন অবস্থানকালীন সময়ে কছর করতেন (আবূ দাঊদ, হা/১২৩৫; আহমাদ, হা/১৪১৩৯)।

যাকাত

প্রশ্ন (১১): আমার কাছে এক ভরি সোনা আছে, যা নিসাব পরিমাণ নয়; কিন্তু এর দামে সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপা কেনা যায়। এ অবস্থায় কি তাতে যাকাত দিতে হবে?

-মো. আতিকুর রহমান, রাজশাহী।

উত্তর: স্বর্ণের যাকাতের নিসাব হলো সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ। সুতরাং এক ভরি স্বর্ণে যাকাত ফরয হবে না; যদিও এর মূল্য দ্বারা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপা ক্রয় করা যায়। কারণ স্বর্ণ ও রূপার নিসাব স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন (আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩)।

দান-ছাদাকা

প্রশ্ন (১২): দান বা ছাদাকা করার সময় যদি নিয়্যত করি, হে আল্লাহ, এই দান আমার পক্ষ থেকে এবং জীবিত-মৃত সব মুসলিমেরও পক্ষ থেকে; তাহলে কি এভাবে নিয়্যত করা জায়েয? আর এর ছওয়াব কি সবার কাছে পৌঁছাবে?

–কাওছার আহমেদ, টাউনহল, ময়মনসিংহ।

উত্তর: হ্যাঁ, এভাবে নিয়্যত করা জায়েয এবং এই ছাদাকার ছওয়াব উল্লিখিত সবাই পাবে, ইন-শা-আল্লাহ! আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ : "نَعَمْ".

নিশ্চয় একজন ব্যক্তি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলল, আমার মা আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার ধারণা, যদি তিনি কথা বলার সুযোগ পেতেন, তাহলে ছাদাকা করতেন। এখন যদি আমি তার পক্ষ থেকে ছাদাকা করি, তাহলে কি তিনি এর ছওয়াব লাভ করবেন? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ' (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৮৮)। উল্লেখ্য, উক্ত বিধানের ক্ষেত্রে জীবিত এবং মৃত ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য নেই।

ছিয়াম

প্রশ্ন (১৩): আমি শুধু বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ছিয়াম পালন করি। সমস্যার কারণে সোমবারের ছিয়ামটা রাখতে পারি না। তাহলে এটা কী সাপ্তাহিক ছিয়াম হিসেবে গণ্য হবে?

-মো. আতিকুর রহমান, রাজশাহী।

উত্তর: যারা ছিয়ামরত অবস্থায় তাদের আমলকে আল্লাহর সামনে পেশ করতে চায় তাদেরকে সোমবার ও বৃহস্পতিবার দুদিন ছিয়াম রাখতে হবে। এরূপ দুদিন না রাখলে এমন আমল থেকে ফিরে আসতে হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখতেন (ইবনু মাজাহ, হা/১৭৪০)। আরেক বর্ণনায় আছে, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর নিকট বান্দার আমলসমূহ পেশ করা হয়' (আবূ দাঊদ, হা/২৪৩৬)।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (১৪): পণ্য বিক্রির জন্য ক্রেতার কাছে আকর্ষণীয় কিছু মিথ্যা কথা বলা যাবে কি? যেমন- এটা আপনাকে খুব মানাবে। এই পোশাকে আপনাকে অসাধারণ লাগবে।

-মো. জসিম, শাজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর: পণ্য বিক্রি করার জন্য ক্রেতার কাছে আকর্ষণীয় মিথ্যা কথা বলা হারাম এবং কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, যা ব্যবসার বরকত নষ্ট করে দেয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আর যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দিবে, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১)। হাকীম ইবনু হিযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের ইখতিয়ার থাকবে (ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা বা বাতিল করা)। যদি তারা সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হয় (ছহীহ বুখারী, হা/২০৭৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৩২)।

প্রশ্ন (১৫): জুমআর খুৎবার সময় ইমাম যা বলছেন তা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে মোবাইল বা বই-খাতা দেখা কি জায়েয?

-মো. শহিদুল ইসলাম, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর: জুমআর খুৎবা মনোযোগ দিয়ে শোনা ফরয। খুৎবার সময় অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত হওয়া নিষিদ্ধ। এমনকি কাউকে 'চুপ করো' বলাও নিষিদ্ধ। তাই খুৎবার সময় কুরআন-হাদীছ মিলানোর জন্য মোবাইল বা বই দেখা জায়েয নয়; বরং এটা খুৎবা শোনার ফরয হুকুমের বিরোধী। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'জুমআর দিন খত্বীব যখন খুৎবা দিচ্ছেন, তখন তুমি যদি তোমার সঙ্গীকে বলো চুপ করো, তবে তুমিও অনর্থক কাজে লিপ্ত হলে' (ছহীহ বুখারী, হা/৯৩৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৫১)। অত্র হাদীছে শুধু 'চুপ করো' বলা যা নেক কাজ হলেও এতটুকুই লঘু (অর্থহীন) কাজ হিসেবে গণ্য হয়েছে। তাহলে মোবাইল দেখা, বই খোলা বা নোট নেওয়া তো আরো বেশি ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে খুৎবার সময় কঙ্কর নাড়াচাড়া করল, সে অনর্থক কাজে লিপ্ত হলো' (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৫৭)। এখানে ছোট্ট একটি অঙ্গভঙ্গিও অনর্থক কাজ হিসেবে ধরা হয়েছে। মোবাইল চালানো বা বই দেখা তো আরো বড় ব্যস্ততা। সুতরাং এ কর্মগুলো তো আরো নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন (১৬): হালাল পশুর কাঁচা মাংস বা কাঁচা মাছ খাওয়া কি জায়েয?

-আবির আহমেদ লিখন, জামালপুর।

উত্তর: কাঁচা মাছ খাওয়া মৌলিকভাবে জায়েয। অনুরূপভাবে হালাল প্রাণীর কাঁচা গোশত খাওয়া মৌলিকভাবে জায়েয এই শর্তে যে, শারঈ পদ্ধতিতে যবেহকৃত হতে হবে এবং যবেহ করার সময় যে রক্তগুলো প্রবাহিত হয়, সেগুলো যেন উক্ত গোশতের সাথে মিশ্রিত না হয়। যদি মিশ্রিত হয়, তাহলে তা পানি দিয়ে ধৌত করে তারপর খাওয়া যাবে। কারণ প্রবাহিত রক্ত হারাম (আল-আনআম, ৬/১৪৫)। তবে যদি রেজিস্টার্ড ডাক্তারগণ এ ধরনের কাঁচা গোশত খাওয়া ক্ষতিকর বলেন, তাহলে তা খাওয়া জায়েয হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের (ক্ষতির) দিকে ঠেলে দিয়ো না' (আল-বাকারা, ২/১৯৫)। উল্লেখ্য, হালাল হলেই খেতে হবে তা নয়; বরং সতর্কতার সাথে খেতে হবে। উম্মুল মুনযির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার বাসায় আসলেন। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও তার সাথে ছিলেন। আমাদের খেজুরের ছড়া ঝুলিয়ে রাখা ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা থেকে খেতে আরম্ভ করলেন। তার সাথে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও খেতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, 'হে আলী! থামো থামো! তুমি তো অসুস্থতাজনিত দুর্বল'। বর্ণনাকারী বলেন, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বসে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খেতে থাকলেন। আমি (উম্মুল মুনযির) তাদের জন্য বীট এবং বার্লি বানিয়ে আনলাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে আলী! তুমি এটা খেতে পার, তোমার জন্য এটা বেশি উপযোগী' (তিরমিযী, হা/২০৩৭)।

প্রশ্ন (১৭): অফিসে কাউকে ডেকে পাঠানোর সময় বলা হয়, 'বস আপনাকে সালাম দিয়েছেন'। শুধু ডাকার উদ্দেশ্যে এভাবে বলা কি জায়েয?

উত্তর: না, জায়েয নয়। বরং এমতাবস্থায় বস আপনাকে ডেকেছেন বা স্মরণ করেছেন এসব ভাষা ব্যবহার করতে হবে। এমতাবস্থায় বস আপনাকে সালাম দিয়েছেন বললে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হবে; যা জায়েয নয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার খিয়ানত করবে না, তার বিষয়ে মিথ্যা বলবে না, তাকে অপমানিত হতে দিবে না' (তিরমিযী, হা/১৯২৭)।

প্রশ্ন (১৮): মসজিদ, মাদরাসা বা বিভিন্ন জালসার টাকা তোলার জন্য রাস্তায় মাইক দিয়ে গাড়ি আটকিয়ে তা সংগ্রহ করা কি জায়েয?

উত্তর: ইসলামে মসজিদ, মাদরাসা, গরীবদের সাহায্যের জন্য দান চাওয়া বৈধ। কিন্তু তা হতে হবে সম্মানজনকভাবে, কারো চলাচলে বা স্বাভাবিক কাজে বিঘ্ন না ঘটিয়ে, বিনয়ের সাথে এবং কারো ওপর চাপ সৃষ্টি না করে। এইভাবে মসজিদ, মাদ্রাসা বা বিভিন্ন জালসার জন্য রাস্তায় গাড়ি আটকিয়ে টাকা তোলা নাজায়েয। কেননা এভাবে টাকা তুললে মানুষের চলাফেরায় বিঘ্ন ঘটানো হয়, মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয়, অনেক সময় টাকা না থাকলে মানুষ লজ্জিত ও হয়রানির শিকার হয়, ইসলামকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয় ইত্যাদি। উবাদা ইবনু ছামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতি সহ্যও যাবে না' (ইবনু মাজাহ, হা/২৩৪০)। হুযায়ফা ইবনু আসীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুসলিমদের চলার পথে কষ্ট দেয়, তার উপর তাদের অভিশাপ অবধারিত হয়ে যায়' (আল-মু'জামুল কাবীর, ৩/১৭৯, ৩০৫০)।

প্রশ্ন (১৯): আমি টেইলারের কাজ করি। অনেক সময় ব্লাউজ বা থ্রি-পিস এমনভাবে বানাতে হয় যা শরীআতের দৃষ্টিতে পর্দার সাথে মানানসই নয়। আমি মানুষকে বুঝালেও তারা শোনে না। এভাবে পোশাক বানালে কি আমার গুনাহ হবে?

উত্তর: স্বাভাবিকভাবে পোশাক বানানো হালাল কাজ। অনেক সময় কিছু পোশাক থাকে, যেগুলো মানুষ কীভাবে ব্যবহার করবে তা অন্যের পক্ষে নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়। যেমন ব্লাউজ সে বাড়িতে তার স্বামীর সামনেও পরিধান করতে পারে। বাহিরে বের হলে বোরখা পরিধান করেও বের হতে পারে। সুতরাং শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হালাল কাজকে হারাম মনে করার দরকার নাই।

প্রশ্ন (২০): ফেসবুক, ইউটিউব চালাতে গিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু মেয়েদের বিজ্ঞাপন আসে যা দেখতেই হয়। এক্ষেত্রে করণীয় কি?

উত্তর: যদি ইচ্ছাকৃতভাবে না দেখেন, হঠাৎ চোখ পড়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নেন, তাহলে এতে গুনাহ নেই; তবে সাবধানতার ব্যবস্থা নেওয়া জরুরী। অনিচ্ছাকৃত অশ্লীল বা মেয়েদের বিজ্ঞাপন দেখার সময় করণীয়- ১. চোখ সরিয়ে নিন। ২. বিজ্ঞাপন হাইড বা রিপোর্ট করুন। ৩. Restricted Mode চালু করুন (ইউটিউবে)। ৪. ফেসবুকের Ad Preferences ব্যবহার করুন। ৫. নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন এবং ইবাদতে মন দিন। ৬. বিশেষ সফটওয়্যার বা অ্যাড ব্লকার ব্যবহার করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে' (আন-নূর, ২৪/৩০)। ইবনু বুরায়দা রাহিমাহুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে বলেছিলেন, 'হে আলী! এক দৃষ্টির পড়ার পর আরেক দৃষ্টি অনুসরণ করো না। প্রথম দৃষ্টি তোমার, কিন্তু দ্বিতীয়টি তোমার নয়' (আবূ দাঊদ, হা/২১৪৯)।

প্রশ্ন (২১): কোনো পুরুষ শিক্ষকের কাছে কি মহিলারা ক্লাস করতে বা শিক্ষা অর্জন করতে পারবে?

উত্তর: শরীআতের সীমা ও সতর্কতা মেনে পুরুষ শিক্ষকের কাছে মহিলারা শিক্ষা অর্জন করতে পারবে, যদি ফেতনার আশঙ্কা না থাকে। যেমন- ১. শিক্ষক যেন সৎ ও ধার্মিক বলে পরিচিত হন। ২. নারীরা যেন কণ্ঠে কোমলতা বা প্রলুব্ধকর ভঙ্গি না করে কথা বলেন। ৩. শিক্ষকের সঙ্গে কথা শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক প্রয়োজনীয় পরিমাণেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ৪. শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষাকালীন সময়ে বা পরে নারীদের একান্তে কোনো কথোপকথন করা যাবে না ইত্যাদি। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নারীরা একদা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলল, পুরুষেরা আপনার নিকট আমাদের চেয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই আপনি নিজে আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারিত করে দিন। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের অঙ্গীকার করলেন, সে দিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তাদের নছীহত করলেন এবং নির্দেশ দিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/১০১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৩৪)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো পুরুষ যেন কোনো (বেগানা) নারীর সাথে মাহরাম ব্যতীত একাকী না থাকে' (ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৩৫)।

প্রশ্ন (২২): বাবা-মা চান আমি চাকরি করি, কিন্তু আমার ইচ্ছা ব্যবসা বা কৃষি কাজে। বাবা-মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এগুলো করা কি জায়েয হবে?

–সিয়াম, পশ্চিম দেওভোগ, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর: সন্তানের উপর বাবা-মায়ের অনেক হক্ব রয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে ও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাদীছে বহু স্থানে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এর মানে এই নয় যে, সন্তান বাবা-মায়ের পছন্দমতো চাকরি বা পেশা বেছে নিতে বাধ্য। বরং সন্তানের উচিত, মা-বাবার প্রতি সম্মান বজায় রেখে, ভদ্রভাবে নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহের বিষয়টি তাদের সামনে তুলে ধরে তাদেরকে সন্তুষ্ট করে এমন পথ বেছে নেওয়া, যেখানে সে আগ্রহী, তার সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তা শরীআতসম্মত এবং বাস্তবভিত্তিক। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি রয়েছে' (তিরমিযী, হা/১৮৯৯)।

প্রশ্ন (২৩): বিধর্মীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দোকান দেওয়া বা ভাড়া দেওয়া কি বৈধ?

-মো. সাজেদুর রহমান সাজু, সদর, দিনাজপুর।

উত্তর: না, বিধর্মীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান (পূজা, উৎসব, বা মূর্তিপূজার মেলা) উপলক্ষে দোকান দেওয়া বা ভাড়া দেওয়া জায়েয নয়। কারণ এটি কুফর ও শিরককে সহযোগিতা করা হবে। আর অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না (আল-মায়েদা, ৫/২)। সুতরাং অন্য কোনো ধর্ম বা শিরকী কাজে অংশগ্রহণ করা বা তাতে সাহায্য করা মুসলিমের জন্য হারাম। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) একটি ঘোড়া আটকিয়ে রাখে (লালনপালন করে), আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে; তবে সেই ঘোড়ার খাওয়া, পান করা, বিষ্ঠা ও প্রস্রাব— সবকিছুই কিয়ামতের দিনে তার নেকীর পাল্লায় (ছওয়াব হিসেবে) ওযন করা হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/২৮৫৩)। এ হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর পথে সহযোগিতার জন্য কোনো কাজ করলে যেমন ছওয়াব হয় তেমনি শিরক, পূজা বা হারাম কাজে সহযোগিতা করলে গুনাহ হয়।

প্রশ্ন (২৪): এককালীন পেমেন্টে এক বছরের জন্য স্বাস্থ্যবীমা নেওয়া হয়, যার টাকা ফেরত দেওয়া হয় না— এটা কি শরীআতসম্মত?

-হুমাইরা।

উত্তর: না, স্বাস্থ্যবীমাসহ বর্তমানে প্রচলিত এরকম আরো যত বীমা আছে তার কোনোটিই শরীআতে বৈধ নয়। কেননা- ১.

এর মাঝে সূদ রয়েছে অর্থাৎ টাকা জমিয়ে কোম্পানির পক্ষ থেকে অধিক টাকা দেওয়া হয়, যা ইসলামে হারাম (আল-বাকারা, ২/২৭৫)। ২. এসব বীমায় এক অনিশ্চিত বিষয়ের উপর চুক্তি করা হয়। কারণ বিপদ-আপদ ও দুর্ঘটনা ঘটবে কি-না সে ব্যাপারে কারো জানা নেই। এরকম অনিশ্চিত বিষয়ের উপর চুক্তি করা স্পষ্ট ধোঁকাবাজি, যা ইসলামে হারাম (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫১)। ৩. বীমা জুয়ার সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ এতে হয় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লাভবান হয় অথবা জমাকারী লাভবান হয় আর জুয়া ইসলামে নিষিদ্ধ (আল-মায়েদা, ৫/৯০)। সুতরাং এমন বীমা থেকে প্রত্যেক মুসলিমের বেঁচে থাকতে হবে।

প্রশ্ন (২৫): রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের পাপাচার, পাত্রপক্ষের কাছে মেয়ের পরিবারের দোষ, বন্ধুকে কারো অযোগ্যতার কথা জানানো বা অফিসের সহকর্মীর গাফিলতি বসকে জানানো— এসব ক্ষেত্রে সত্য বললে তা কি গীবত হবে, নাকি শরীআত এতে অনুমতি দেয়?

-রকিবুল হাসান, হাওয়ালভাংগী, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তর: গীবতের ব্যাপারে হাদীছে এসেছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা কি জান, গীবত কী?' তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-ই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, '(গীবত হলো) তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে'। প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাই এর মধ্যে বাস্তবিকই থেকে থাকে, তবে আপনি কী বলেন? তিনি বললেন, 'তুমি তার সম্পর্কে যা বলছ, তা যদি তার মধ্যে প্রকৃতই থেকে থাকে; তাহলেই তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তো তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৯)। কিন্তু ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ ছহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় (শরহে মুসলিম ১৬/১৪২) ৬টি ক্ষেত্র উল্লেখ করেছেন, যা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়- ১. যুলমের অভিযোগ জানানো। যেমন- কেউ কারো যুলমের শিকার হয়ে শাসক বা দায়িত্বশীলের কাছে অভিযোগ করে, অমুক আমার উপর যুলম করেছে- এটা গীবত নয়; বরং ন্যায়বিচারের জন্য বলা অনুমোদিত। মহান বলেন, 'যিনি অত্যাচারিত, তার পক্ষে অন্যায়ের অভিযোগ প্রকাশ করা অনুমোদিত' (আন-নিসা, ৪/১৪৮)। ২. অন্যকে গুনাহ বা ক্ষতি থেকে সতর্ক করা। যেমন- কোনো মেয়ের পাত্র সম্পর্কে পরিবারকে জানানো, সে ছালাত পড়ে না, মাদকাসক্ত, প্রতারক ইত্যাদি। বন্ধুকে বলা, অমুকের সঙ্গে ব্যবসা করো না, সে বিশ্বাসযোগ্য নয়। অফিসে বসকে জানানো, এই কর্মচারী দায়িত্বে গাফিল। এগুলো গীবত নয়, বরং সতর্ক করা দায়িত্ব। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দ্বীন হলো নসীহা' (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৫)। ৩. রাষ্ট্র ও সমাজের মঙ্গলার্থে সতর্ক করা। যেমন- কোনো নেতা বা দায়িত্বশীল ব্যক্তি প্রকাশ্যে ফাসাদ করছে, জনগণকে ভুল পথে নিচ্ছে বা দ্বীনবিরোধী কাজ করছে। এক্ষেত্রে সত্য প্রকাশ করে সাধারণ মুমিনদের সতর্ক করার জন্য বৈধ। তবে তা আদব ও প্রমাণসহ হতে হবে, গীবত বা কটাক্ষের উদ্দেশ্যে নয়। ৪. কোনো মুফতী বা আলেমকে বাস্তব ঘটনা জানানো। যেমন- কেউ বলে, আমার স্বামী এমন-এমন করে, এ অবস্থায় আমার করণীয় কী? এ ধরনের প্রশ্নে অন্যের ত্রুটি বর্ণনা করলে তা গীবত নয়, বরং ফতওয়া চাওয়ার বৈধ উপায়। উম্মু সালামা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলেছিলেন, আবূ সুফিয়ান কৃপণ; তিনি আমাকে পর্যাপ্ত খরচ দেন না...। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে কোনো নিষেধ করেননি (ছহীহ বুখারী, হা/৭১৮০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৪)। ৫. প্রকাশ্য পাপী বা বিদআতকারীকে প্রকাশ করা। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গুনাহ করে বা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, তার মন্দ কাজ সম্পর্কে সতর্ক করা গীবত নয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার উম্মতের সবাইকে ক্ষমা করা হবে, শুধু তারা ছাড়া যারা প্রকাশ্যে গুনাহ করে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬০৬৯)। ৬. পরিচয়ের জন্য বলা। যেমন- কেউ অন্ধ, খোঁড়া, বধির ইত্যাদি নামে পরিচিত এবং যখন তাকে অন্যভাবে চেনানো সম্ভব নয়।

প্রশ্ন (২৬): খেলা দেখা কি হারাম? যেমন- ক্রিকেট বা ফুটবল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় খেলাধুলা সম্পর্কিত প্রশ্ন আসে। তাই খেলা না দেখে শুধু খবর জানা বা পড়া কি ইসলামে জায়েয হবে? এতে কি কোনো পাপ আছে?

-সাদেক হোসেন, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর: ক্রিকেট ও ফুটবলসহ বর্তমানে প্রচলিত প্রায় সব খেলাই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত, যা হারাম। এছাড়াও এতে সময় ও অর্থের অপচয় হয় এবং এতে অশ্লীলতা, বাজে গান, অশালীন পোশাক, গালাগালি থাকে। সুতরাং তা পরিত্যাগ করা আবশ্যক (আল-মায়েদা, ৫/৯০)। এজন্য ভর্তি পরীক্ষা থেকে শুরু করে দেশের যেকোনো পরীক্ষায় পরীক্ষা বোর্ড কমিটির এ সংক্রান্ত প্রশ্ন না দেওয়াই উচিত। তারপরও বর্তমানে যেহেতু বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলোতে এ সংক্রান্ত প্রশ্ন আসে, সুতরাং শুধু শিক্ষাগত প্রয়োজনে খবর জানা বা পড়া যেতে পারে।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (২৭): আমি অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সিতে টিকিট বুকিংয়ের কাজ করি। আগে ন্যূনতম টাকা রিচার্জ করতে হয়, পরে বুকিং অনুযায়ী কমিশন ও বোনাস মেলে। এ আয় কি হালাল?

-মেহেদী হাসান শাকিল, ফুলতলা-চৌড়হাস, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।

উত্তর: ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ করার জন্য শুরুতেই কোনো ট্রাভেল ফ্র্যাঞ্চাইজির মেম্বারশিপ বা সদস্যপদ ক্রয় বাবদ যে অর্থ প্রদানের শর্তারোপ করা হয়, তা বৈধ নয় এবং এই অর্থ প্রদান ঘুষ প্রদানের নামান্তর। আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার প্রতি অভিসম্পাত করেছেন (আবূ দাঊদ, হা/৩৫৮০)। তবে টিকেট বুকিং এর বৈধ কাজ। এক্ষেত্রে শ্রম দেওয়া এবং এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক, কমিশন ও বোনাস গ্রহণ করা বৈধ (ছহীহ বুখারী, ৩/৯৩; আল-মুগনী, ৫/৩৪৫)।

প্রশ্ন (২৮): ধান লাগানোর আগেই কৃষকের কাছ থেকে অগ্রিম কম দামে ধান কেনা হয় এবং ধান ওঠার পর ধান অথবা সে সময়ের বাজারমূল্য অনুযায়ী ধানের দাম নেওয়া হয় (যা অগ্রিম

মূল্যের চেয়ে বেশি)। এ ধরনের লেনদেন কি হালাল, নাকি সূদী কারবার?

–সিহাব আলী, সদর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: অগ্রিম মূল্যে কোনো পণ্য আগেভাগে কেনার একটি পদ্ধতি হচ্ছে, بيع السَلَم বাইয়ে সালাম অর্থাৎ অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে ভবিষ্যতে পণ্য ক্রয় করা। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসেন, তখন মদীনাবাসী ফলে দুই ও তিন বছরের মেয়াদে বাইয়ে সালাম করত। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কোনো ব্যক্তি বাইয়ে সালাম করলে, সে যেন নির্দিষ্ট মাপে এবং নির্দিষ্ট ওযনে নির্দিষ্ট মেয়াদে বাইয়ে সালাম করে' (ছহীহ বুখারী, হা/২২৪০)। তবে প্রশ্নে উল্লেখিত পদ্ধতিতে লেনদেন সূদী হবে। কেননা ধান ওঠার পরে কখনো ধান নেন, আবার কখনো ধানের মূল্যও নেন, যা একই জিনিস এর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। সুতরাং তা সূদী কারবার। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান ও নগদ নগদ হতে হবে। এরপর কেউ যদি বাড়তি কিছু প্রদান করে বা অতিরিক্ত গ্রহণ করে, তবে তা সূদ হয়ে যাবে। গ্রহণকারী ও প্রদানকারী এতে একই রকম হবে (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯৫৬)।

প্রশ্ন (২৯): কেউ যদি আমাকে হাদিয়া দেয় বা খাবারের দাওয়াত দেয় এবং আমি জানি, তার উপার্জন হারাম; তাহলে আমার করণীয় কী? আর যদি না জানি তার উপার্জন হালাল নাকি হারাম, তখন কী করব? কোন কারণে উপার্জন হারাম হয়? আর যদি পরিবারের উপার্জন হারাম হয়, যাদের উপর আমি নির্ভরশীল; তাহলে আমার করণীয় কী?

–ইসরাত ইশা, ঝালকাঠি, নবগ্রাম রোড, সুগন্ধী।

উত্তর: আপনি নিশ্চিতরূপে যদি জানতে পারেন যে, হাদিয়া প্রদানকারীর উপার্জন সম্পূর্ণ হারাম, তাহলে তার থেকে হাদিয়া বা খাবার গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মানুষ! তোমরা খাও যমিনে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে' (আল-বাকারা, ২/১৬৮)। আর যদি জানতে না পারেন যে, তার উপার্জন হারাম নাকি হালাল; তাহলে তার থেকে হাদিয়া গ্রহণ করা যাবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন তার মুসলিম ভাইয়ের কাছে প্রবেশ করে আর সে তাকে কিছু খাবার খাওয়ায়, তখন সে যেন খায় আর তা নিয়ে জিজ্ঞেস না করে। আর যদি সে তাকে কিছু পানীয় দেয়, তবে সে যেন পান করে, কিন্তু (পানীয় সম্পর্কে) প্রশ্ন না করে' (ছহীহুল জামে', হা/৫৮০)। কোনো ব্যক্তির উপার্জন তখনই হারাম হয়, যখন তা ইসলামী শরীআতের নির্ধারিত সীমা ও নীতিমালা লঙ্ঘন করে। যেসব কারণে উপার্জন হারাম হয়, তা হলো সূদ (রিবা) থেকে আয়, জুয়ার আয়, চুরি, ডাকাতি, ঘুষ বা প্রতারণা করে আয়, হারাম পণ্য বা সেবার মাধ্যমে উপার্জন ইত্যাদি। আপনি যদি হারাম উপার্জনকারী পরিবারের ওপর নির্ভরশীল হন এবং আপনি নিজে উপার্জন করতে সক্ষম না হন (যেমন- আপনি শিশু, ছাত্র, বৃদ্ধ, অসুস্থ ইত্যাদি), তাহলে তাদের উপার্জন ভক্ষণ করলে আপনি পাপী হবেন না। আর যদি আপনি উপার্জনে সক্ষম হন, তাহলে নিজেকে স্বনির্ভর করার চেষ্টা করুন এবং হালাল রিযিক খোঁজার চেষ্টা করুন, পরিবারকে হালাল উপার্জনের দিকনির্দেশনা দিন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর যে কেউ আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণের) পথ করে দেবেন' (আত-ত্বালাক, ৬৫/২)।

প্রশ্ন (৩০): কাল্পনিক নাম ও ছবি ব্যবহার করে ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম, লিঙ্কড-ইন ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভেরিফায়েড একাউন্ট তৈরি করে বিক্রি করলে এবং সেগুলো অশ্লীল বা হারাম কাজে ব্যবহার না হলে এই আয় কি হালাল হবে?

-আব্দুল্লাহ আল মামুন, রংপুর সদর।

উত্তর: সামাজিক মাধ্যমের নিয়ম (Terms of Service) হিসেবে প্রতিটি বড় প্ল্যাটফর্ম (Facebook, Instagram, LinkedIn) স্পষ্টভাবে বলে দেয় যে, আপনাকে আপনার নিজস্ব আসল নাম ও পরিচয় ব্যবহার করতে হবে। ভুয়া, বিভ্রান্তিকর বা অন্যের পরিচয়ে অ্যাকাউন্ট তৈরি করা নিষিদ্ধ অর্থাৎ আপনি যদি ভেরিফাইড অ্যাকাউন্টে ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করেন, তাহলে আপনি তাদের নিয়মও ভঙ্গ করছেন। এটি চুক্তি লঙ্ঘন (نقض العهد), যা শরীআতে কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। মহান বলেন, 'তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ করো; অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে' (আল-ইসরা, ১৭/৩৪)। এভাবে চুক্তি ভঙ্গ করে কাল্পনিক নাম ও ছবি ব্যবহার করে উপার্জন করা হারাম। কেননা এতে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১)।

প্রশ্ন (৩১): মোবাইল বা কম্পিউটারে ফ্রি-ফায়ার, পাবজি ইত্যাদি গেম খেলা কি হালাল? এসব গেমে টুর্নামেন্ট আয়োজন করে প্রাইজ মানি দেওয়া হয়। এভাবে খেলে উপার্জন করা কি বৈধ? আর এমন টুর্নামেন্ট আয়োজক কোম্পানিতে গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসেবে কাজ করে যেখানে টুর্নামেন্টের লোগো, ব্যানার ও পোস্টার তৈরি করতে হয়। এই উপার্জন কি হালাল হবে?

-ইলিয়াস শেখ, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: ফ্রি-ফায়ার, পাবজিসহ যেকোনো মোবাইল ফোনের গেম খেলা জায়েয নয়। কেননা এতে সময় নষ্ট হয়, বাজি ধরা হয়। আর বাজি ধরে খেলা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! জেনে রাখো, মদ, জুয়া, লটারি ও ভাগ্য নির্ণয়ক তির এ সবই শয়তানের অশ্লীল কর্ম। অতএব, তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তোমাদের মাঝে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ ছড়াতে চায় এবং আল্লাহর যিকির ও ছালাত আদায় করতে বাধা সৃষ্টি করতে চায়। অতএব, তোমরা কি এগুলো থেকে বিরত হবে না' (আল-মায়েদা, ৫/৯০-৯১)। এছাড়াও এতে দুনিয়া ও আখেরাতের কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে না

এবং মানুষকে আল্লাহর যিকির থেকে বিমুখ রাখে। সুলায়মান ইবনু বুরায়দা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নারদাশীর (পাশা বা এমন খেলা যাতে শারীরিক ও শরীআতের কোনো কল্যাণ নেই) খেলবে, সে যেন তার হাতকে শূকরের গোশত ও রক্তে রঞ্জিত করল' (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৬০; আবূ দাঊদ, হা/৪৯৩৯)। এসব খেলা যখন হারাম, তখন এসব খেলে উপার্জন করাও হারাম এবং এমন টুর্নামেন্টে গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসেবে কোনো ব্যানার ও পোস্টার তৈরি করে দিয়ে উপার্জন করাও হারাম। কেননা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করতে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন (আল-মায়েদা, ৫/২)।

শিক্ষাব্যবস্থা

প্রশ্ন (৩২): সন্তানকে আলেম বানাতে চাইলে ৪-৫ বছর বয়স থেকে তার শিক্ষা কীভাবে শুরু করা উচিত?

-শাকিবুল ইসলাম, ফরিদপুর।

উত্তর: সন্তানকে সুযোগ্য আলেম হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পিতামাতার জন্য প্রথম করণীয় হলো, নিয়্যত বিশুদ্ধ করা। পাশাপাশি সন্তানকেও নিয়্যত বিশুদ্ধ করতে তাগিদ দেওয়া। কারণ ইলম অর্জন করা ইবাদত আর ইবাদত বিশুদ্ধ নিয়্যত ব্যতীত শুদ্ধ হয় না (ছহীহ বুখারী, হা/০১; আবূ দাঊদ, হা/৩৬৬৪)। এরপর বিশুদ্ধ আক্বীদা ও মানহাজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাই করা। সেখানে প্রথমে নূরানী বিভাগ সম্পন্ন করা। এরপর স্মৃতিশক্তির পর্যায় বিবেচনা করে হিফয বিভাগ সম্পন্ন করা। এরপর কিতাব বিভাগে দাওরায়ে হাদীছ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক অধ্যয়ন করা। দাওরায়ে হাদীছ সম্পন্ন করার পর সময় ও সুযোগ হলে তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ ইত্যাদি বিষয়ে তাখাছ্ছুছ তথা বিশেষজ্ঞতা অর্জন করা। এক্ষেত্রে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বা এ পর্যায়ের কোনো বিদেশী স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হলে ভালো হয়।

প্রশ্ন (৩৩): পিতামাতা অনেক টাকা খরচ করে আমার পড়াশোনা করাচ্ছেন এবং আশা রাখছেন যে, আমি বড় কিছু হব। যদি আমি পড়াশোনা শেষ না করি বা কিছু না হতে পারি, ফলে তারা কষ্ট পাবেন। তাহলে কি আমার গুনাহ হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সাভার, ঢাকা।

উত্তর: যদি আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে পড়াশোনা নষ্ট করেন, পরিশ্রম না করেন এবং আর্থিক ক্ষতি করেন, তাহলে সেটা পিতামাতার প্রতি অন্যায় হবে এবং আপনার গুনাহ হবে। আর আপনি যদি চেষ্টা করার পরও সফল না হন বা আপনার পিতামাতা আপনার সফলতাকে সফলতা মনে না করেন, তাহলে আপনি যেখানে পৌঁছেছেন সেটাই আপনার তাকদীর। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ কারও উপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত' (আল-বাক্বারা, ২/২৮৬)।

মীরাছ বা উত্তরাধিকার

প্রশ্ন (৩৪): পিতার মৃত্যু হলে সন্তানরা দাদার সম্পত্তিতে অংশ পায় না। অথচ ইয়াতীম নাতি-নাতনিদের প্রয়োজন বেশি থাকে, তবু ইসলামী শরীআতে তাদের অধিকার নেই। এতে আল্লাহর কী হিকমত রয়েছে?

-আব্দুর রাকিব বিন আহমেদ, ইকরা ফাউন্ডেশন, সখের বাজার, নীলফামারী।

উত্তর: ইসলামের বিধান অনুযায়ী নাতি তার দাদার ওয়ারিছ হবে না, যদি তার পিতা তার দাদার পূর্বে ইন্তিকাল করে থাকে এবং তার আপন চাচা জীবিত থাকে। এক্ষেত্রে কী হিকমত রয়েছে এটা জানার পূর্বে আমাদের জন্য আবশ্যক হলো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, ইসলামের প্রত্যেক বিধানে আল্লাহ তাআলার হিকমত রয়েছে এবং মানুষের জন্য কল্যাণ, সেটা আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক। পবিত্র কুরআনে ওয়ারিছদের অংশ বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

'তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী তা তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' (আন-নিসা, ৪/১১)। উক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কে ওয়ারিছ হবে আর কে হবে না এবং কার অংশ কী পরিমাণ হবে এ ব্যাপারে মানুষ জ্ঞান রাখে না; বরং আল্লাহ তাআলা সর্বাধিক জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা রাখেন। দ্বিতীয়ত, উক্ত বিধানের ক্ষেত্রে আলেমগণ যে হিকমতের কথা উল্লেখ করে থাকেন তা হলো, যখন উক্ত নাতির পিতা ইন্তিকাল করেছিলেন, তখন নাতি ওয়ারিছ হয়েছিল এবং তার উপস্থিতির কারণে তার চাচারা ওয়ারিছ হতে পারেনি। তেমনিভাবে যখন তার দাদা ইন্তিকাল করলেন, তখন তার চাচাদের উপস্থিতির কারণে সে ওয়ায়িছ হতে পারবে না, এটাই শরীআত। কারণ উভয়ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির সরাসরি সন্তানকে তার ভাই বা নাতির ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ইসলাম তার দাদার জন্য এই সুযোগ রেখেছে যে, তিনি তার ইয়াতীম নাতি-নাতনিদের জন্য মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে অছিয়ত করতে পারবেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৬৮)। তাদের চাচাদের জন্য উচিত হলো, প্রাপ্ত সম্পত্তি থেকে কিছু অংশ উক্ত ইয়াতীম নাতি-নাতনিদের প্রদান করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾

'আর যখন (মীরাছ) বণ্টনের সময় (ওয়ারিছ নয় এমন) আত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তাদেরকেও তা থেকে কিছু দাও এবং তাদেরকে উত্তম কথা বলো' (আন-নিসা, ৪/৮)। এছাড়াও এসময় চাচারা পরীক্ষিত। তারা পিতার স্থানে ভাতিজাকে লালনপালনের দায়িত্ব পালন করবেন, দায়িত্বে অবহেলা করলে গুনাহগার হবে।

পারিবারিক জীবন

প্রশ্ন (৩৫): আমার স্ত্রীর বান্ধবী মারা যাওয়ায় তার পরিবার আমার স্ত্রীকে মেয়ের মতো ভালোবাসে। তারা চান আমরা তাদের 'আব্বু-আম্মু' বলে ডাকব এবং তারাও আমাদের 'মেয়ে-জামাই' হিসেবে সম্বোধন করবেন। শরীআতের দৃষ্টিতে এভাবে সম্বোধন করা কি জায়েয?

-ইউসুফ আলী শামীম, মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তর: সম্মান প্রদর্শন পূর্বক কোনো মুরব্বী পুরুষকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করা এবং কোনো মুরব্বী নারীকে 'মা' বলে সম্বোধন করা জায়েয; যদিও তারা জন্মদাতা পিতামাতা না হন। অনুরূপভাবে স্নেহ করে বয়সে ছোট কাউকে 'সন্তান' বলে সম্বোধন করা জায়েয, যদিও সে আপন সন্তান না হয়।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে يَا بُنَيَّ (হে আমার প্রিয় ছেলে!) বলে সম্বোধন করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/২১৫১)। খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ওয়ারাকা ইবনু নাওফালকে বললেন, হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন (ছহীহ বুখারী, হা/৩)। তবে সতর্কতার বিষয় হলো, উক্ত সম্পর্ক এবং সম্বোধন যেন শারঈ সীমারেখা অতিক্রম করতে সহযোগিতা না করে। কারণ অনেকেই এসব সম্বোধনের আড়ালে ইসলামী বিধিবিধান লঙ্ঘন করে। বিশেষ করে পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে। সুতরাং যদি ইসলামী বিধিবিধান লঙ্ঘন হয় অথবা লঙ্ঘনের আশঙ্কা থাকে, তাহলে এসব সম্পর্ক ও সম্বোধন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾ 'তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর বাণী শ্রবণ করো এবং তাঁর আনুগত্য করো' (আত-তাগাবুন, ৬৪/১৬)।

প্রশ্ন (৩৬): চাকরির কারণে আমি ঢাকায় থাকি, স্ত্রী থাকে গ্রামে। প্রায় এক বছর আলাদা থাকায় স্ত্রী বলে আমি তার হক্ব নষ্ট করছি। কিন্তু তাকে ঢাকায় নিয়ে আসার বা আমার গ্রামে থাকার সামর্থ্য নেই। এ অবস্থায় আমার করণীয় কী?

-মাহফুজুর রহমান, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর: উভয়ের সম্মতিতে ও উভয়ের যোগাযোগের ভিত্তিতে স্বামী-স্ত্রী আলাদা থাকা যায়। বরং এতে কেউ বাড়াবাড়ি করলে একজন অপরজনের প্রতি যুলম করা হবে। আর্থিক অবস্থা অনুকূলে হলে স্ত্রীকে সাথে রাখাই উত্তম। এ অবস্থায় আপনার জন্য আমাদের পরামর্শ- ১. সামর্থ্য না থাকলে, সময়ভিত্তিক ভারসাম্য করুন। আপনি যদি পুরোপুরি গ্রামে গিয়ে থাকতে না পারেন, তাহলে মাসে বা দুই মাসে একবার হলেও কয়েকদিনের জন্য স্ত্রীকে সময় দিন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ কোনো প্রাণকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না' (আল-বাকারা, ২/২৮৬)। ২. ভবিষ্যতে স্ত্রীর সাথে থাকার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা করুন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চান। ৩. স্ত্রীর সাথে দৈনন্দিন নিয়মিত যোগাযোগ চলমান রাখুন।

প্রশ্ন (৩৭): আমার স্বামী ৫ বছর ধরে প্রবাসে আছেন। তিনি তার উপার্জনের প্রায় সবটাই আমার শ্বশুরবাড়ির চাহিদা পূরণে ব্যয় করেন। আমাদের জন্য ব্যয় খুব সামান্য, কোনো সঞ্চয়ও নেই। সন্তানরা বাবার অনুপস্থিতিতে কষ্ট পাচ্ছে, আমিও হতাশাগ্রস্ত। স্বামীকে বললেও তিনি শুধু ধৈর্য ধরতে বলেন। স্ত্রী হিসেবে এ অবস্থায় আমার করণীয় কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, লাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।

উত্তর: খরচের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা উচিত। পিতামাতার যেমন হক্ব আছে, তেমনি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী-পুত্রেরও হক্ব আছে। তাই সকলের প্রয়োজন পূরণ করাই ন্যায়সঙ্গত। কাউকে বঞ্চিত করা উচিত হবে না। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবারের জন্য ব্যয় করো' (মুসনাদে আহমাদ, হা/২২০৭৫)। স্বামীকে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সামর্থ্যবান যেন নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে আর যার রিযিক সংকীর্ণ করা হয়েছে সে যেন আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তা হতে ব্যয় করে (আত-তালাক, ৬৫/৭)। তিনি আরো বলেন, 'সন্তানের পিতার দায়িত্ব হলো মায়ের খাওয়া-পরার খরচ বহন করা যথাযথভাবে' (আল-বাকারা, ২/২৩৩)। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, 'আর তোমাদের উপর তাদের (স্ত্রীদের) ন্যায়সঙ্গত ভরণপোষণের ও পোশাক-পরিচ্ছদের হক্ব রয়েছে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮)। পিতামাতার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা না থাকলে সন্তানকে সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। এতে কেউ কারো প্রতি অভিযোগ করলে তা যুলম হবে।

প্রশ্ন (৩৮): এক দ্বীনদার মহিলা (বয়স ২৮) তার গুরুতর অসুস্থ শ্বশুরকে (বয়স ৭০-৮০) অন্য কোনো সহযোগী না থাকায় উঠা-বসা করানো ও ইস্তিঞ্জা (প্রস্রাব-পায়খানা) পরিষ্কার করাতে বাধ্য হন। এতে শরীআতের সমাধান কী? এতে তার গুনাহ হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: মাহরাম হিসেবে এরূপ অবস্থায় শ্বশুরের সার্বিক সেবাই বউমাকেই থাকতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের প্রকৃত পুত্রদের স্ত্রীগণ (তাদের শ্বশুরের জন্য মাহরাম)' (আন-নিসা, ৪/২৩)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুনিয়ার কষ্ট দূর করে, আল্লাহ তার কিয়ামতের কষ্ট দূর করবেন' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯)। কাবশা বিনতু কা'ব ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি আবূ কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্রবধূ ছিলেন। আবূ কাতাদা (শ্বশুর) তার নিকট এলেন। তিনি বলেন, আমি তার জন্য ওযূর পানি ঢাললাম (তিরমিযী, হা/৯২)।

প্রশ্ন (৩৯): সন্তান গর্ভে আসার খবর উৎসাহের সঙ্গে অন্যকে জানানো কি শরীআতসম্মত? এতে কোনো ক্ষতি বা উপকারের বিষয় শরীআতে উল্লেখ আছে কি?

-উমর ফারুক, আকন্দপাড়া, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তর: কুরআন বা ছহীহ হাদীছে এমন কোনো সরাসরি আদেশ বা নিষেধ নেই। সুতরাং কেউ যদি দু'আর উদ্দেশ্যে পরিবার বা ঘনিষ্ঠজনকে জানায়, তাহলে জানাতে পারে। তবে ঢালাওভাবে সবাইকে না জানানো ভালো। কেননা তাতে কারো শত্রুতা বাড়তে পারে, বদনজর থাকতে পারে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদনজর সম্পর্কে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই নজর সত্য। যদি কদরকে তথা ভাগ্যকে অতিক্রম করার কিছু থাকত, তবে বদনজরই তা অতিক্রম করত' (ছহীহ মুসলিম, হা/২১৮৮)। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে বৎস! তোমার স্বপ্ন তোমার ভাইদেরকে বলো না, তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে' (ইউসুফ, ১২/৫)।

প্রশ্ন (৪০): এক নারী হানাফী মত অনুযায়ী অভিভাবক ছাড়া বিয়ে করেছিল। পরে সে জানতে পারে যে, হাদীছ অনুযায়ী

www.al-itisam.com

অভিভাবক ছাড়া বিয়ে ছহীহ নয়। এখন সে অনুতপ্ত ও ওয়াসওয়াসায় ভুগছে, এখন তার বিয়ের হুকুম কী হবে? অতীতে করা ওই বিয়ের দায় থেকে কি সে মুক্ত থাকবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বরিশাল।

উত্তর: অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে শুদ্ধ হয় না। এটি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্পষ্ট বাণী দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে নারী অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করে, তার বিয়ে বাতিল, বাতিল, বাতিল' (আবূ দাঊদ, হা/২০৮৩; ইবনু মাজাহ, হা/১৮৮০)। এখন তার করণীয় হলো অভিভাবকের অনুমতিসহ নতুন করে বিবাহ করা এবং আগের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। নতুন বিয়ের শর্ত হলো- ১. অভিভাবক (বাবা/দাদা/ভাই বা শরীআত নির্ধারিত অলী) থাকতে হবে। ২. দুইজন মুসলিম, ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী থাকতে হবে। ৩. নতুন করে ইজাব ও কবুল হতে হবে।

মহিলা বিষয়ক

প্রশ্ন (৪১): নারীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চুল কাটা বা ছাড়ার নিয়ম কী? চুল কাটলে কি গুনাহ হবে?

–সাকিরুল ইসলাম, শুক্রবাড়ী, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর: জন্মের সপ্তম দিনে ছেলেমেয়ে সকলের চুল মুণ্ডন করতে হবে। তবে সপ্তম দিনের পর মেয়েদের চুল ন্যাড়া করতে হবে মর্মে কোনো হাদীছ নেই। বরং লম্বা রাখাই ভালো। তবে কিছু ছোট করতে পারে। আবূ মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মুণ্ডনকারী নারী থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/১২৯৬)। আবূ সালামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ মাথার চুল কেটে রাখতেন, তা ওয়াফরা এর ন্যায় হয়ে যেত (ঘাড় বরাবর লম্বা চুলই ওয়াফরা) (ছহীহ মুসলিম, হা/৩২০)। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরুষ এবং পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণকারী নারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৫)। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত' (আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১)।

প্রশ্ন (৪২): যদি কোনো মহিলা লুজ ফিটিং (এমন পোশাক যা শরীরের সাথে আঁটসাঁটো হয়ে লেগে থাকে না) বিভিন্ন রঙ ও ডিজাইনের পোশাক পরে, যা সারা শরীর ও মুখ ঢাকে- এতে কি তার পর্দা আদায় হবে?

-আদনান, পেয়ারাতলা, কুষ্টিয়া।

উত্তর: শরীআতের দৃষ্টিতে শুধু লুজ ফিটিং (ঢিলা) পোশাক পরাই যথেষ্ট নয়; বরং পর্দার শর্তগুলো যথাযথ পালন করতে হবে। তাহলে শারঈ পর্দা বলে গণ্য হবে। নিচে পর্দার শর্তগুলো দেওয়া হলো- ১. শরীর পুরোপুরি ঢাকা (শুধু মুখমণ্ডল খুলতে পারে, তবে ঢেকে রাখাই ভালো)। ২. পোশাক যেন ঢিলেঢালা হয়। ৩. পোশাক যেন ঘন হয়, যাতে শরীরের অঙ্গসৌষ্ঠব ফুটে না ওঠে। ৪. পোশাক যেন আকর্ষণীয় সাজসজ্জা ও এমন রঙের না হয়, যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ৫. পোশাক যেন পুরুষের পোশাকের অনুরূপ না হয় অথবা কাফের ও ফাসেকের পোশাকের সদৃশ না হয়। ৬. যেন সুগন্ধিযুক্ত না হয়। ৭. প্রাণীর ছবিযুক্ত না হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তবে যা স্বভাবত প্রকাশ পায়' (আন-নূর, ২৪/৩১)। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি খ্যাতি লাভের জন্য পোশাক পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সেরূপ পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে (আবূ দাঊদ, হা/৪০২৯)। অন্য হাদীছে এসেছে, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নম্রতাবশত সৌন্দর্যবর্ধক পোশাক পরা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন (আবূ দাঊদ, হা/৪৭৭৮)।

আকীকা

প্রশ্ন (৪৩): বর্তমানে অনেকে আকীকার গোশত বণ্টন না করে দাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান করে। এ পদ্ধতি কি শরীআতসম্মত, নাকি গোশত বণ্টন করাই উত্তম?

-মো. ওমর ফারুক, বনশ্রী, ঢাকা।

উত্তম: আকীকা পিতার যিম্মাদারী, যা সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে পালন করতে হবে। আকীকার গোশত পিতার নিজস্ব গোশত। তিনি নিজে খাবেন, আত্মীয়-স্বজনকে দিবেন, মানুষকে দাওয়াত করে খাওয়াবেন এবং ফকীর-মিসকীনকে দিবেন। এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আকীকার গোশতকে কুরবানীর গোশতের মতো মনে করে দুঃস্থ-গরীবের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে এ ধারণা আদৌ ঠিক নয়। কেননা কুরবানীর গোশত ফকীর-মিসকীনকে দেওয়া আল্লাহর আদেশ। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'প্রত্যেক শিশু তার আকীকার বিনিময়ে দায়বদ্ধ থাকে। কাজেই সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে আকীকা যবেহ করবে এবং তার মাথা মুণ্ডন করে নাম রাখবে' (আবূ দাঊদ, ২/৩৯২)।

আমল-দু'আ

প্রশ্ন (৪৪): বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কী কী আমল ও দু'আ পড়তে হয়?

-মো. মিনহাজ পারভেজ, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর: ইসলাম আমাদের বিপদ, দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষার সময় পড়ার জন্য অনেক দু'আ ও আমল শিখিয়ে দিয়েছে। নিচে মূল কিছু দু'আ ও আমল তুলে ধরা হলো- ১. দু'আ ইউনুস পড়া। لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ 'আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই, তুমি পবিত্র, আমি ছিলাম যালিমদের অন্তর্ভুক্ত'। এ দু'আ পড়লে আল্লাহ বিপদ থেকে মুক্তি দেন (ছহীহ তিরমিযী, হা/৩৫০৫)। ২. এ দু'আ পড়া لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ. (ছহীহ বুখারী, হা/৭৪২৬)।

৩. দুশ্চিন্তা দূর করার দু'আ, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, ভীরুতা ও কৃপণতা থেকে, ঋণের বোঝা ও মানুষের যুলম

থেকে’ (ছহীহ বুখারী, হা/২৮৯৩)। ৪. আয়াতুল কুরসী প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা ও ঘুমের আগে পড়লে আল্লাহ হেফাযত করবেন (ছহীহ বুখারী, হা/ ২৩১১)। ৫. সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, সূরা ইখলাছ, ফালাক, নাস সকাল-সন্ধ্যা ও ঘুমের আগে পড়লে সব ধরনের ক্ষতি থেকে নিরাপদে রাখা হয় (ছহীহ বুখারী, হা/৫০১৭; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৯২)।

৬. এ দু‘আ পড়া, بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ ‘আল্লাহর নামে (শুরু করছি), যার নামে কোনো কিছুর কোনো ক্ষতি হয় না আসমান ও যমিনে। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ’ (আবূ দাঊদ, হা/৫০৮৮; ছহীহ তিরমিযী, হা/৩৩৮৮)। ৭. ছাদাকা করা (তিরমিযী, হা/৬৬৪)। ৮. নফল ছালাত আদায় করা। এসবের মাধ্যমে বিপদ থেকে মুক্তি চাইতে হবে।

প্রশ্ন (৪৫): জনৈক ব্যক্তি বয়সন্ধিকালে পাপ করে আল্লাহর কসম খেয়ে পাপ থেকে বেঁচে থাকার শপথ করে। অতঃপর আবার সে পাপে জড়িয়ে যায়। আবার সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় ও তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করে, তাহলে কি তার পাপ ক্ষমা হবে? পাপ থেকে বাঁচার কোনো দু‘আ বা মাধ্যম আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: এ অবস্থায় নিরাশ না হয়ে ক্ষমা চেয়ে যেতে হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে এ কথা বলতে শুনেছি, ‘এক বান্দা গুনাহ করল। তারপর সে বলল, হে আমার রব! আমি তো গুনাহ করে ফেলেছি। তাই আমার গুনাহ ক্ষমা করে দাও। তার প্রতিপালক বললেন, আমার বান্দা কি একথা জেনেছে যে, তার রয়েছে একজন রব, যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। আমার বান্দাকে আমি মাফ করে দিলাম। তারপর সে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী কিছুকাল অবস্থান করল এবং সে আবার গুনাহতে জড়িয়ে গেল। বান্দা আবার বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আবার গুনাহ করে বসেছি। আমার এ গুনাহ তুমি মাফ করে দাও। তখন আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা কি জেনেছে যে, তার আছে একজন রব, যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। এরপর সে বান্দা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছুকাল সে অবস্থায় থাকল। আবারও সে গুনাহতে জড়িয়ে গেল। সে বলল, হে আমার রব! আমি তো আরো একটি গুনাহ করে ফেলেছি। আমার এ গুনাহ মাফ করে দাও। তখন আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা কি জেনেছে যে, তার একজন রব আছেন, যিনি গুনাহ মাফ করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। আমি আমার এ বান্দাকে মাফ করে দিলাম। এরকম তিনবার বললেন’ (ছহীহ বুখারী, হা/৭৫০৭)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘শয়তান বলেছিল, হে আমার প্রভু! আপনার মহিমার কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার বান্দাদের প্রাণ তাদের দেহে থাকবে, আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে ছাড়ব না। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, আমার মহিমা ও গৌরবের কসম! যতক্ষণ তারা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাদের ক্ষমা করতে থাকব’ (মুসনাদে আহমাদ, হা/১১২৩৭)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মানুষ মাত্রই গুনাহগার। আর গুনাহগারদের মধ্যে তওবাকারীরাই উত্তম’ (তিরমিযী, হা/২৪৯৯)। প্রশ্নকারী যেহেতু কসম করে আবার পাপ করে কসম ভঙ্গ করেছে, সেহেতু তাকে কাফফারা আদায় করতে হবে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট তওবা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা যেসব কসম দৃঢ়ভাবে করো, সেগুলোর জন্য কাফফারা হলো দশজন গরিবকে খাবার খাওয়ানো অথবা তাদের পোশাক দান করা অথবা একজন দাস মুক্ত করা’ (আল-মায়েদা, ৫/৮৯)।

পাপ থেকে মুক্তির শারঈ পদ্ধতি: ১. আন্তরিক তওবা (আত-তাহরীম, ৬৬/৮)। ২. তাহাজ্জুদ ও ইস্তেগফার (আয-যারিয়াত, ৫১/১৭-১৮), ৩. পাপের কারণ থেকে দূরে থাকা, পাপের পরিবেশ, বন্ধু, ওয়েবসাইট, চিন্তা বা ছবি থেকে দূরে থাকা (মুসনাদ আহমাদ, হা/২২১৭৪, ছহীহ)। ৪. দু‘আ করা, اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ‘হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, আমার তওবা কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু’ (তিরমিযী, হা/৩৫৫১)। ৫. নেক আমলে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। ছালাত, নফল ছিয়াম, কুরআন তিলাওয়াত, দান-ছাদাকা ইত্যাদি ভালো কাজগুলো করা (তিরমিযী, হা/১৯৮৭)। ৬. হতাশ না হওয়া (আয-যুমার, ৩৯/৫৩)।

প্রশ্ন (৪৬): ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান বৃদ্ধির কোনো উপায় বা দু‘আ আছে কি?

-সাজেদুল ইসলাম, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: জ্ঞান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ দান। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। যেমন- আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালাম -কে জ্ঞান দান করেছিলেন (আল-বাকারা, ২/৩১)। জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বেশি বেশি এ দু‘আ করতে হবে, যেমন মূসা আলাইহিস সালাম করতেন, رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন’ (ত্বা-হা, ২০/১১৪)। এছাড়াও বেশি বেশি পড়াশুনা করা, যিকির তথা আল্লাহকে স্মরণ করা, পাপ থেকে দূরে থাকা, অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ ত্যাগ করা, রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার পর আল্লাহর কাছে দু‘আ করার মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়।

আয়াত ও হাদীছের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪৭): ‘মাকামে মাহমূদ’ কি স্থান না মর্যাদা হিসেবে বুঝানো হয়েছে?

-শাহিদুল ইসলাম, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর: ‘মাকামে মাহমূদ’ দ্বারা মর্যাদা ও পদ বুঝানো হয়েছে, স্থান নয়। এটি এমন এক বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান, যা আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন একমাত্র তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে প্রদান করবেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আর রাতের কিছু অংশে আপনি তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করুন। এটি আপনার জন্য নফল ইবাদত। অচিরেই আপনার রব আপনাকে উত্তম মর্যাদাসম্পন্ন স্থানে (مَقَامًا مَّحْمُوْدًا) অবস্থান করাবেন’ (আল-ইসরা,

১৭/৭৯)। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষ হাঁটু গেঁড়ে বসবে, প্রত্যেক উম্মত তাদের নবীর কাছে গিয়ে বলবে, হে অমুক! আমাদের জন্য সুপারিশ করো। অবশেষে শাফাআত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছবে। সেদিন আল্লাহ তাঁকে 'মাকামে মাহমূদ' অর্থাৎ সুপারিশ করার সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত করবেন। তিনি (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'এটাই সেই মাকাম, যেখানে আমি আমার রবকে প্রশংসা করব' (ছহীহ বুখারী, হা/৪৭১৮)।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৮): চাকরির জন্য ব্যাংক একাউন্ট খুলে ডেবিট কার্ড নিয়েছিলাম। এখন কার্ড ব্যবহার করি না, টাকাও নেই। তাই বার্ষিক ফি কাটা হয় না। এ অবস্থায় কি আমার গুনাহ হবে?

-মামুন, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর: কার্ড সংক্রান্ত বার্ষিক ফি প্রদানের সম্পর্ক কার্ড সংক্রান্ত সেবাপ্রাপ্তির সাথে। যেহেতু বর্তমানে কার্ড ব্যবহার করার মাধ্যমে ব্যাংকের সেবা গ্রহণ করা হচ্ছে না, তাই বার্ষিক ফি প্রদানের বিষয়টি প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং গুনাহ হওয়ার আশঙ্কা নেই (আল-মুগনী, ৫/৩২২)। তবে জরুরী প্রয়োজন ছাড়া এসব কার্ড ব্যবহার করা থেকে বেঁচে থাকাই ভালো।

প্রশ্ন (৪৯): এভারেস্ট বা অন্য কোনো দুর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থান জয়ের চেষ্টা করতে গিয়ে কেউ মারা গেলে, তা কি আত্মহত্যা বা পাপ হিসেবে গণ্য হবে?

-আব্দুর রহমান, শাজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর: যদি কেউ অতিরিক্ত ঝুঁকি জেনেশুনে অকারণে বা অহংকার প্রদর্শন করে কোনো দুর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থান জয় করার চেষ্টা করতে গিয়ে মারা যায়, তাহলে তা আত্মহত্যার শামিল। আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমের মাঝে বলেন, 'আর তোমরা স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না। আর তোমরা ইহসান করো, নিশ্চয় আল্লাহ মুহসিনদের ভালোবাসেন' (আল-বাক্বারা, ২/ ১৯৫)। আর কেউ যদি কোনো বৈধ লক্ষ্যে (যেমন- উদ্ধার অভিযান, বৈজ্ঞানিক কাজে আরোহণ, গবেষণা ইত্যাদি) আরোহণ করতে গিয়ে দুর্ঘটনাক্রমে পড়ে মারা যায়, তাহলে তা আত্মহত্যার শামিল হবে না।

প্রশ্ন (৫০): করযে হাসানা (বিনা সূদে ধার) কাদের দেওয়া উচিত? আমাদের এলাকায় অধিকাংশ প্রতিবেশী বিলাসিতা, কিস্তি বা অনর্থক কাজে ধার চায়। তাদেরকে ধার না দিলে সম্পর্ক নষ্ট হয় বা অহংকারী মনে করে। এ অবস্থায় আমাদের করণীয় কী?

-কবিরুল ফরাজী, গোপালগঞ্জ।

উত্তর: করযে হাসানা বা বিনা সূদে ধার দেওয়া ইসলামে অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ। মহান আল্লাহ বলেন, 'কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে (অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনা সূদে দান বা ধার দেবে), তাহলে আল্লাহ তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দেবেন' (আল-বাক্বারা, ২/২৪৫)। তবে তা কেবল প্রকৃত প্রয়োজনে থাকা সৎ, বিশ্বস্ত ও ফেরত দিতে সক্ষম ব্যক্তিদের দেওয়া উচিত। বিলাসিতা বা গাফেল কাজের জন্য কেউ ধার চাইলে, তাকে ধার না দেওয়াই উত্তম। মহান আল্লাহ বলেন, 'অবিবেচক (অপচয়কারী) লোকদের তোমাদের সেই সম্পদ দিয়ো না, যা আল্লাহ তোমাদের জীবিকার উপায় হিসেবে দিয়েছেন' (আন-নিসা, ৪/৫)। আর সম্পর্ক নষ্টের ভয় থাকলে নরম আচরণ ও হিকমত সহকারে বলা যে, আমি ধার দেই না বা এ জাতীয় কথা বলা, যেন কারো সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি না হয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর অত্যাচার করবে না, তাকে অপদস্ত করবে না এবং হেয় প্রতিপন্ন করবে না' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৬৪)।

'সম্পাদকীয়'-এর বাকী অংশ

গত কয়েক শতব্দী যাবৎ মিডিয়ার পেছনে ইসরাঈল যত অর্থ বিনিয়োগ করেছে, তার সকল পরিশ্রম ও ইনভেস্ট এই যুদ্ধে মাটির সাথে মিশে গেছে। যা ইসরাঈলের বিশাল ব্যর্থতা।

পরিশেষে, আমাদের মনে রাখতে হবে— দুনিয়াবী সক্ষমতা কখনোই জয়-পরাজয়ের মানদণ্ড নয়। বর্তমান গাযার মানুষ ও মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো ইসরাঈল ও আমেরিকার কাছে যত অসহায়, ফেরাউনের শক্তির কাছে মূসা আলাইহিস সালাম তার চেয়ে শতগুণ অসহায় ছিলেন। মূসা আলাইহিস সালাম বিজয় অর্জন করেছিলেন গায়েবী মদদে। মহান আল্লাহর শক্তি-সামর্থ্যের উপর যেন মূসা আলাইহিস সালাম-এর অগাধ আস্থা তৈরি হয়, তার অন্যতম একটি মাধ্যম ছিল লাঠিকে সাপে পরিণত করার মু'জিযা। যার মাধ্যমে মূসা আলাইহিস সালাম জানতেন মহান আল্লাহ যেকোনো কিছু করতে পারেন। আল্লাহর শক্তির উপর এই অগাধ অস্থাই মূসা আলাইহিস সালাম-কে তার আদর্শে অটল থাকতে সাহায্য করেছিল। যুগে যুগে মুসলিমরা কখনোই দুনিয়াবী শক্তির উপর ভরসা করে বিজয় লাভ করেনি; বরং সবসময় মহান আল্লাহর অদৃশ্য গায়েবী শক্তির সহযোগিতায় জয়লাভ করেছে। এমনকি স্বয়ং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় মহান আল্লাহ বদর, উহুদ ও খন্দকসহ বিভিন্ন যুদ্ধে ফেরেশতা অবতীর্ণ করে সহযোগিতা করেছেন। এই জন্য মুসলিমদের সবচেয়ে জরুরী হচ্ছে আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার সাথে পরিচিত হওয়া। কুরআনের শিক্ষার মাধ্যমে সেই জ্ঞান অর্জন করা। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামাআতে আদায়, রাতের ছালাত ও সকাল-সন্ধ্যার যিকিরের মাধ্যমে মহান আল্লাহর গায়েবী মদদ অর্জন করা। নিজ আদর্শের উপর অটল থাকা। ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যবাদিতার চর্চার মাধ্যমে প্রকৃত নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো। যেকোনো জাতির মধ্যে এই বিষয়গুলোর সংমিশ্রণ ঘটলে তারা দুনিয়াবী যত দুর্বলই হোক না কেন, মহান আল্লাহর সহযোগিতায় বিজয় তাদের পদচুম্বন করবে ইনশাআল্লাহ। *(প্র. স.)*

মাকতাবাতুস সালাফ
সালাফি মানহাজে বিশুদ্ধ ফিকহ চর্চার এক অনন্য গ্রন্থ
ফিকহুস সালাফ
লেখক: আল্লামা নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহ.)
দলীলভিত্তিক আলোচনা,
মাযহাবীয় পক্ষপাতহীন ব্যাখ্যা
সুন্নাহ ও ছাহাবীদের বুঝ অনুযায়ী মাসায়েল
পুরো সেট
১৭৫০
১৫৭৫
টাকা মাত্র
মাসিক আল-ইতিছামের সম্মানিত গ্রাহক-এজেন্টগন পাচ্ছেন ১০% ছাড়ে
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
০১৪০৭-০২১৮৪৭
MaktabatusSalaf

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন
অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বরসমূহ
আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)
দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)
আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য
মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)
যাকাতের জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)
মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)
মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)
নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

Monthly Al-Itisam الإعتصام 10th Year, 1st Part, November 2025, Price : 30.00
মুক্তির একমাত্র অবলম্বন
সালাফী মানহাজের অনুসরণ
প্রতিপাদ্য
ইসলামী রাজনীতি
প্রেক্ষিত
বাংলাদেশ
সালাফী কনফারেন্স
২০২৫-২৬
অনুষ্ঠানের সময়সূচি
৯ম বার্ষিক
রাজশাহী
৬ ও ৭ নভেম্বর ২০২৫
সময়: ১ম দিন বাদ আছর হতে শুরু
স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী
১০ম বার্ষিক
ঢাকা
২৯ ও ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
সময়: ১ম দিন বাদ আছর হতে শুরু
স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
বীরহাটাব-হাটাব, বীরবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
৫ম বার্ষিক
দিনাজপুর
৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সময়: জুম'আর খুতবার মধ্য দিয়ে শুরু
স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
তেঘরা, বিরল, দিনাজপুর
সভাপতিত্ব করবেন
শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন; মহাপরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বাংলাদেশ
বক্তব্য পেশ করবেন:
সালাফী মানহাজের অনুসারী বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম
আয়োজনে
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ ও দিনাজপুর। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭, ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫
ব্যবস্থাপনায়
আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ
ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী। মোবা: ০১৪০৭-০২১৮১৫